

ইতিহাস

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

[মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত]
নং সিল ৬৮।৫৫, তারিখ ১৮।১০।৫৫ গেজেট দেখুন এবং
২৪।১০।৬৩ তারিখের পত্র অনুযায়ী সংশোধিত ও পরিমার্জিত

ইতিহাস

বর্তমান যুগ

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নব পর্যায়

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ও ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য

এশিয়া
পাবলিশিং কোং

প্রকাশনায়
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহনবাগান লেন
কলিকাতা-৪

সংশোধিত সংস্করণ
নভেম্বর—১৯৬৬

॥ ২·০৬ ॥

সূচী

মধ্যযুগে ইয়োরোপের জীবন ছিল ভারাক্রান্ত। সমাজ এবং মানুষ ছিল যেন নিয়মকানুনের ছাঁচে ঢালা ফরমাশী জিনিস। সর্বদা একশ' রকমের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অথবা কাজ করিবার যো নাই। একদিকে পোপ আর এক দিকে সম্রাট, উভয়ের শাসনদণ্ড সর্বদা উঁচু হইয়া আছে—শাস্ত্রের বিধান, আইনের নির্দেশ, প্রাচীন প্রথা, কোন কিছুর ব্যতিক্রম হইলে আর রক্ষা নাই। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই লোকের মনে একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। পাদরীরা সকলে বুঝাইতেন যে জীবনে সুখ নাই। ঈশ্বরের নাম-জপ করিয়া কোন-রকমে পৃথিবীর জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলে স্বর্গরাজ্যে যথার্থ সুখের সন্ধান মিলিবে।

এই বন্ধন ও বিবাদ হইতে মানুষ মুক্তি পাইল দু'টি আন্দোলনের মধ্য দিয়া—রিনাইসেন্স ও রিফর্মেশন।

রিনাইসেন্স ঃ রিনাইসেন্স মানে নবজন্ম। প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ছিল মুক্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর। গ্রীস ও রোমের সাহিত্যে, দর্শনে, কলায়, বিজ্ঞানে মুক্তি ও আনন্দের বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। রিনাইসেন্স আন্দোলন গ্রীস-রোমের সভ্যতার এই সমস্ত অমূল্য দানকে উদ্ধার করিল আর তাহাদের চর্চার মধ্য দিয়া ইয়োরোপে ফিরাইয়া আনিল মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ। এই আন্দোলনের ফলে মানুষ জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে শিখিল, শুরু করিল শাস্ত্রবিধান ও আপ্তবাক্যের সমালোচনা,

আর বলিয়া বসিল যে জীবনটা কাঁদিয়া কাটাইবার জন্য নয়, জীবন আনন্দের জন্য। স্বর্গের সুখ এই পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতে হইবে।

কাজেই ঐতিহাসিকরা বলেন যে রিনাইসেন্স আন্দোলনের আগে ছিল মধ্যযুগ, পরে শুরু হইল বর্তমান যুগ। দুই যুগের মাঝখানে এই আন্দোলন যেন একটি সেতু রচনা করিয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া ইয়োরোপের সভ্যতা এক যুগ হইতে আর এক যুগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাধারণতঃ কনস্টান্টিনোপ্‌ল শহরের পতন (১৪৫৩) হইতে ধরা হয় রিনাইসেন্স ও বর্তমান যুগের আরম্ভ। আসলে এভাবে অকস্মাৎ এক যুগ শেষ হইয়া আর এক যুগ আরম্ভ হয় না। ইতিহাসের যুগ-পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ,—বহুদিন ধরিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হয়। যুগ-বৈশিষ্ট্যের মূল খুঁজিতে হয় আগের যুগের মধ্যে। কেবল বুঝিতে সহজ হয় বলিয়া আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যুগবিভাগ করি।

চিন্তার স্বাধীনতা: মধ্যযুগের শেষাশেষি ইয়োরোপে সব দিক দিয়া চঞ্চলতা দেখা দেয়। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে উইক্লিফ ইংরাজিতে বাইবেলের অনুবাদ করিলেন। ইহার পূর্বে বাইবেল ছিল ল্যাটিন ভাষায় লেখা। গির্জায় উপাসনাও ল্যাটিন ভাষায় চলিত। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক এ ভাষা বুঝিত না, পাদরীরা যাহা বুঝাইতেন তাহাই সকলে বুঝিত। সহজ ভাষায় অনুবাদ বাহির হইবার পর ইংরাজরা বাইবেলের কথা বুঝিতে পারিল এবং নিজের ধর্মের কথা ভাবিতে শিখিল। এদিকে ইয়োরোপের সর্বত্র চাষীরা জমিদারদের জুলুমে নাজেহাল হইয়া উঠিল, তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র অসহ্য হইলে পর তাহারা জমিদারী শাসন ও সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। শিল্পবাণিজ্যের

প্রসারের ফলে দেশ-বিদেশের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইল, শহরে বন্দরে নানাদেশের লোক আসিয়া জড় হইল। পরস্পরের মেলামেশার মধ্য দিয়া ভাবের আদান-প্রদান ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস বাড়িতে লাগিল। ইতঃপূর্বে ধর্মযুদ্ধের সময়ে খ্রীষ্টান সৈন্য ও বণিকরা প্রাচ্য দেশে নূতন ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার প্রভাব লইয়া আসিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিতেছিল শিক্ষার কেন্দ্র—পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয়। এক একজন গুরুমহাশয় কিছু ছাত্র জুটাইয়া লইতেন, মুখে মুখে তাহাদিগকে পড়াইতেন আর নিজেরা এক এক বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা যুক্তিতর্ক দিয়া শাস্ত্রশাসন ও পৈতৃক বিশ্বাসগুলিকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চিন্তার আগল একবার খুলিলে আর অন্ধ বিশ্বাসের বাঁধ টেকে না। তাঁহারা নানাপ্রকারের প্রশ্ন তুলিতে লাগিলেন, প্রচলিত নীতি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

ছাপাখানা আবিষ্কার ও কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতন : এই প্রকারে মানুষের মন যখন স্বাধীন চিন্তার আমেজ পাইতেছে তখন পর পর দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিল। প্রথম হইল ছাপা বই-এর প্রবর্তন। মধ্যযুগে লেখকের বই নকলনবিসরা হাতে নকল করিত। ইহাতে বহু সময় লাগিত এবং বেশি কপি করা সম্ভব হইত না। হাতে লেখায় অনেক ভুল থাকিত। বেশী লোকের ভাগ্যে ইহা পড়িবার সুযোগ জুটিত না। এমন সময়ে প্রাচ্য দেশ হইতে আমদানি হইল কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আর আবিষ্কার হইল ছাপাখানা। সুন্দর কাগজে পরিষ্কার হরফে ছাপা হইয়া বই বাহির হইল, এক সঙ্গে শত শত, হাজার হাজার। ইহাতে ভুলও অল্প। নানারকম চলতি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ বাহির হইল।

সাধারণ লোক ও স্কুলের ছাত্ররা সস্তা নির্ভুল বই হাতে পাইল,—চারিদিকে পড়াশুনার ধুম পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতন। ১৪৫৩ সালে তুর্করা প্রাচ্য রোমসাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করিল। এই নগর ছিল গ্রীক সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং গ্রীক মনীষীদের আশ্রয়। তুর্কদের হাত হইতে এই অমূল্য সাহিত্যসম্পদ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা প্রাচীন পুঁথিগুলি সঙ্গে লইয়া ইতালীতে পলাইয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসু ও চিন্তাচঞ্চল ইয়োরোপের হাতে আসিয়া পড়িল সক্রেটিস ও জেনোর দর্শন, প্লেটো ও এরিস্টট্‌ল-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইউরিপিডিস ও এরিস্টফেনিসের নাটক আর হিপো-ক্রেটিস্‌ ও গেলেন-এর চিকিৎসা-শাস্ত্র। ইয়োরোপের লোক দেখিতে পাইল জ্ঞান ও সৌন্দর্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত এক নূতন জীবন।

ইটালীতে নবজাগরণ ঃ এইরূপে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ইটালীতে এক নূতন জাগরণ দেখা দিল। ইটালী ছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিশ প্রভৃতি নগরী। মেডিচি পরিবারের মত বর্ধিষ্ণু ও মার্জিতরুচি পরিবারে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের আসর বসিল। পোপরাও প্রাচীন শিল্প সাহিত্যের সাধনাকে সমর্থন করিলেন। গ্রীক ও রোমের কাব্য, নাটক, চিত্র, মূর্তি সব মিলিয়া সৃষ্টি হইল এক রসলোক। ইটালীয়গণ ইহার নেশায় মাতিয়া উঠিল। ক্রমশঃ এই শিল্পকলার হাওয়া বহিল উত্তর ও পশ্চিম দিকে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ইটালীর মত সাহিত্য ও চারুকলার চর্চা আরম্ভ হইল, জীবনকে সব দিক দিয়া উপভোগ করিবার বাসনা দেখা দিল।

এই ভাবের জোয়ার যাঁহারা ডাকিয়া আনিলেন তাঁহাদিগকে বলিত 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবধর্মী। অর্থাৎ তাঁহাদের ধর্ম ছিল মানুষকে লইয়া, ঈশ্বরকে লইয়া নয়। একদিন মরিতে হইবে সন্দেহ নাই। তার জন্য এখন হইতে মুখ ভার করিয়া থাকিয়া লাভ কি? জীবনের সৌন্দর্য নিঃশেষে ভোগ করিয়া লও। ভোগের জন্যই ত' জীবন। এথেন্স ও রোমের অধিবাসীরা কত ভাবে জীবনকে উপভোগ করিয়াছে তা দেখা যায় তাহাদের সাহিত্যে ও চারুকলায়। মৃত্যুর পরে তাহাদের স্বর্গসুখ নাই বা জুটিল, কী আসে যায়?

পেট্রার্ক ও বোকাচিও: ইটালীর প্রথম হিউম্যানিস্ট ছিলেন পেট্রার্ক। তাঁহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, পুত্রকে ঐ বৃত্তি শিখাইবার জন্য তিনি ফ্রান্সে পাঠাইলেন। কিন্তু ছেলের আইনবিদ্যা ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা তিনি কবি ও বিদ্বান হইবেন। ফ্রান্স ও ইটালীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়া তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিলেন ও নকল করিলেন। তারপর এক গিরি-উপত্যকায় নির্জনে থাকিয়া করিলেন জ্ঞানবিদ্যার সাধনা, লিখিলেন 'সনেট্স্ টু লরা' নামে এক গীতিকাব্য। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ও নেপ্‌লস্-এর রাজার কাছ হইতে তাঁহার ডাক পড়িল বিদ্যা বিতরণের জন্য। নেপ্‌লস্-এ যাওয়ার পথে রোমের অধিবাসীরা তাঁহার মাথায় শ্রেষ্ঠ কবির গৌরবমুকুট পরাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিল।

তারপর হইতে পেট্রার্ক যেখানে যাইতেন সেখানেই রাজসম্মান পাইতেন। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কখন কখন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন তরুণ বন্ধু বোকাচিও। তিনি সুন্দর গল্প বলিতেন আর 'ডেকামেরন' নামে এক পুস্তিকা লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পেট্রার্ক ও বোকাচিওর ছিল সব কিছু

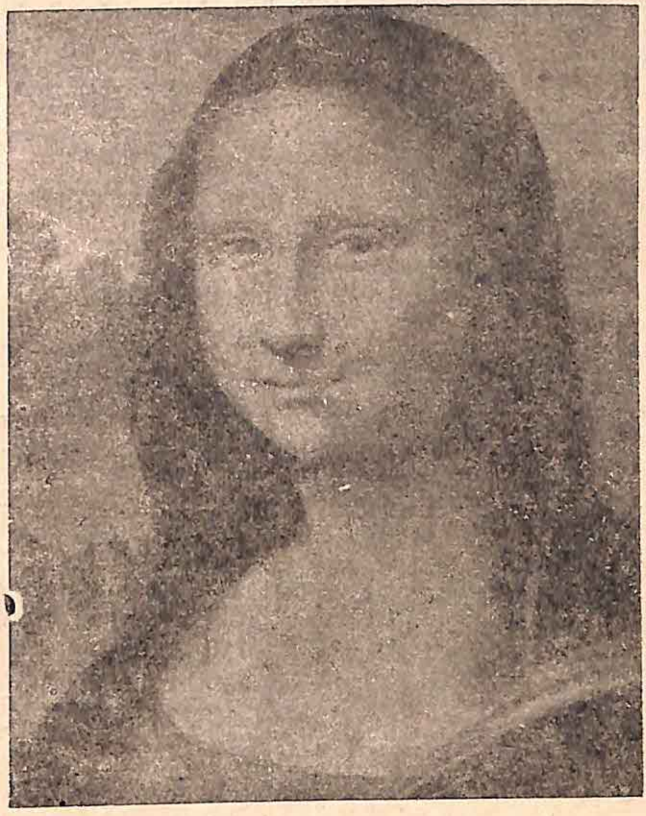
জানিবার আগ্রহ। তাঁহারা গ্রন্থাগার দেখিলেই সেখানে খুঁজিতেন কোন প্রাচীন ল্যাটিন কবির পুঁথি। আর তাঁহারা লিখিতেন ভালবাসার কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা, আলোর ও আনন্দের কথা। তাই লোকে পাগলের মত তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া আসিত।



র‍্যাফেলের চিত্র : 'ম্যাডোনা' বা মাতৃমূর্তি

চারুকলা ও সাহিত্য : কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতনের পর রোমান বিদ্যার সঙ্গে আসিয়া মিলিল গ্রীক বিদ্যা। চিত্রে, ভাস্কর্যে ও

স্থাপত্যশিল্পে গ্রীস-রোমের কলাভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল। চিত্রকলায় র‍্যাফেল, মিকেলেঞ্জেলো এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নূতন যুগ আনিলেন। মিকেলেঞ্জেলো শুধু চিত্রকর ছিলেন না, ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যেও তাঁহার সমান হাত ছিল। তিনি অনেক সুন্দর পাথরের



লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্র: মোনালিসা

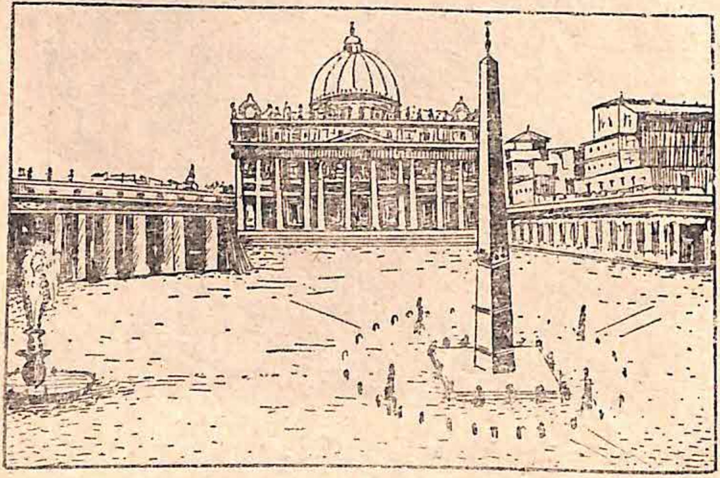
মূর্তি এবং নূতন পদ্ধতির বহু প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। রোমের সেন্ট পীটারের গির্জা তাঁহার প্রধান কীর্তি। লিওনার্দোর প্রতিভা

ছিল আরো বহুমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর, মূর্তিশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি আকাশে বিমান উড়াইবার পরীক্ষা করিয়া অনেকটা সফল হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ প্রাণীদরদী। তিনি মাছ মাংস খাইতেন না এবং জীবজন্তু ভালবাসিতেন। খাঁচার পাখি কিনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার এক বাতিক ছিল।



মিকেলেঞ্জেলোর চিত্র : জিহোভা

ইতালী হইতে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা ছড়াইয়া পড়িল। মঁতেন প্রবন্ধ লিখিয়া এবং মলিয়ের নাটক লিখিয়া ফরাসীভাষায়



সেণ্টপীটারের গির্জা,—রোম

প্রাণসঞ্চার করিলেন। এথেনীয়দের রঙ্গমঞ্চের মত মলিয়ের স্থাপন

করিলেন ফরাসীদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। স্পেনে সার্ভেন্টিস লিখিলেন 'ডন কুইক্‌সোট্' নামে ব্যঙ্গ-উপন্যাস। ইংরাজি ভাষায় রোজার বেকন করিলেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর শেক্‌স্‌পীয়ার লিখিলেন নাটক, যা আজও তার রসগুণে কালিদাসের নাটকের মত অমর হইয়া আছে।



শেক্‌স্‌পীয়ার

হল্যাণ্ডে হইল চিত্রকলার উৎকর্ষ। রেম্‌ব্রাণ্ট, রুবেন্স প্রভৃতি শিল্পীর তুলিতে মানুষ ও প্রকৃতির ভাবরূপ ফুটিয়া উঠিল।

বিজ্ঞানের উন্নতি এত সহজে হয় নাই। কারণ চার্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পছন্দ করিত না। মধ্যযুগে যাজক এবং পণ্ডিতদের মধ্যে নভোমণ্ডল সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে বিশ্বজগতের কেন্দ্র এই পৃথিবী, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, তারাগুলি আকাশে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কোপার্নিকাস নামে পোলাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক এই ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ব্রুনো নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক ঐ একই কথা প্রচার করিবার অপরাধে চার্চের ধর্মনায়করা তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিলেন। গ্যালিলিও ছিলেন আর এক নভোবিজ্ঞানী। তিনিও বলিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। যে পৃথিবীতে আছে খ্রীষ্টধর্ম ও চার্চ সে কখনও সূর্যকে ঘিরিয়া ঘুরিতে পারে! গ্যালিলিওকে প্রাণদণ্ডের ভয়ে

নিজের মত অস্বীকার করিয়া চার্চের ভ্রান্ত বিশ্বাস মানিয়া লইতে হইল।

রাজনীতি : ইয়োরোপীয় নবজাগরণের রাজনৈতিক দিকটা তেমন সুন্দর ছিল না। পবিত্র রোমসাম্রাজ্যের প্রতাপ ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার পর ছোট ছোট রাজন্যদের মধ্যে দলাদলি ও বিবাদ বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে ম্যাকিয়াভেলি নামে একজন ইতালীয় রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক 'প্রিনস্' নামে একটি বই লেখেন। ইহার তাৎপর্য এই যে রাজার একমাত্র কাম্য রাষ্ট্রীয় শক্তি বিস্তার করা। একাজে সফল হইতে হইলে ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত আচরণে বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া সব রকম শঠতা ও চক্রান্তের আশ্রয় লইতে হইবে। ম্যাকিয়াভেলির নাম অনুসারে নীতিবোধহীন কূটনীতিকে বলা হয় ম্যাকিয়াভেলিয়ান কূটনীতি।

রিফর্মেশন : ইটালীয় রিনাইসেন্স আন্দোলন ছিল ভোগপ্রবণ ও সৌন্দর্যপরায়ণ। গ্রীস ও রোমের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে ফিরাইয়া আনিয়া জীবনকে রূপে রসে ও আরামে ভরিয়া তোলা ছিল ইটালীয় হিউম্যানিস্টদের আদর্শ। কিন্তু আল্‌প্‌স্ পর্বত ডিঙাইয়া রিনাইসেন্স মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপে পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার রূপান্তর হইল। জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড দেশের লোকেরা ইটালীয়দের চেয়ে গম্ভীর প্রকৃতির। তাহাদের কাছে ভোগের চেয়ে বড় হইল জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্যের চেয়ে বড় হইল সত্য। সত্যকে জানিতে হইলে প্রত্যেকটি ধারণাকে যুক্তিতর্ক দিয়া যাচাই করিতে

হয়। আর যে ধারণা অসত্য, তা যতই প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। মধ্যযুগে এইরূপ অজস্র অসত্য চার্চের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ব্রুনোর মত প্রাগের ধর্মসংস্কারক হাস্‌ও অসত্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া চার্চের বিচারে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাই ইরাস্‌মাস্ প্রভৃতি হিউম্যানিস্টরা চাহিলেন রিনাইসেন্স আন্দোলনকে চার্চের ভিতরে লইয়া আসিতে, চার্চের গলদ দূর করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করিতে। এই প্রকারে চার্চকে শোধন করিবার জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহার নাম রিফর্মেশন।

চার্চের দুর্নীতি : যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও উপদেশ চার্চের হাতে নানা-ভাবে বিকৃত হইয়াছিল। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানদের জীবন ছিল সরল, বিশ্বাস ছিল গভীর। তাহারা ছিল সর্বত্যাগী ও নম্র। পঞ্চদশ শতকে পোপ ও যাজকদের মধ্যে আর এই গুণ দেখা যাইত না। অর্থ ও ক্ষমতার লোভ তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বিরাট জমিদারীর মালিক। রিনাইসেন্সের সমর্থক পোপরা বিরাট প্রাসাদে শিল্পী ও কবিদের সঙ্গে রসের আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতেন। অর্থ ও আরাম তাঁহাদের নৈতিক জীবনে শিথিলতা আনিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না, তাই অন্ধভাবে তাঁহারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি আঁকড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে অবলম্বন করিয়া চার্চের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে তৎপর হইলেন। অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তাঁহারা ইচ্ছামত যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেন, নানারূপ কাজের উপর বিধিনিষেধ চাপাইয়া নরকের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে তটস্থ করিয়া রাখিতেন। চার্চের প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার জন্য এক ভয়ঙ্কর

প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার নাম ইনকুইজিশন বা বিচার-সভা। এই প্রতিষ্ঠান খবর লইত কোথায় কে চার্চের প্রচারিত ধারণার বিপরীত কোন মত বা তথ্য প্রকাশ করিয়াছে; খবর পাইলেই তাহার বিচার করিত এবং ধর্মদ্রোহের অপরাধে তাহাকে পোড়াইয়া মারিত।

শেষে আরম্ভ হইল পয়সা লইয়া পাপক্ষালন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন পাপ হইতে বাঁচিতে হইলে অনুতাপ করিতে হয় আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। এখন পোপ নোটের মত এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন, তাহা পয়সা দিয়া কিনিলেই নাকি পাপের ক্ষমা হইবে! যে যত বেশী টাকার কাগজ কিনিবে তাহার তত পাপ ক্ষয় হইবে এবং তত নরকভোগের মিয়াদ কমিবে। এমনি ছিল পাপ ও নরকের বিভীষিকা যে অনেকেই সরল বিশ্বাসে এই কাগজ কিনিল। এই কাগজই আবার চার্চের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল।

চার্চের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রধানতঃ জাগিয়া উঠিয়াছিল জার্মানীতে। পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্বে জার্মানরা সম্রাটের প্রজা হিসাবে সম্রাটের পক্ষে ও পোপের বিপক্ষে জড়িত ছিল। পোপের বিলাসিতার ও গির্জা নির্মাণের খরচ তাহাদিগকে যোগাইতে হইত। রাজন্যরাও দেখিলেন তাঁহাদের রাজ্যের অর্থ পোপের হাতে চলিয়া যাইতেছে। শেষে আরম্ভ হইল নরকপারের টিকিট বিক্রি। জার্মানীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

লুথার: জার্মানীর অন্তর্গত স্যাক্সন রাজ্যে ভিটেনবার্গ শহর। ১৫১৭ সালে যখন ধর্মের ব্যবসা চরমে উঠিয়াছে, তখন মার্টিন লুথার নামে এক সন্ন্যাসী এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। একটি কাগজে পাপক্ষয়ের টিকিট বিক্রির বিরুদ্ধে পঁচানব্বই দফা প্রতিবাদ লিখিয়া তিনি শহরের গির্জার দুয়ারে আঁটিয়া দিলেন। চারিদিকে সাড়া

পড়িয়া গেল। অনেকে লুথারকে সমর্থন করিল। পোপ দেখিলেন মান যায় যায়। রোমে লুথারের তলব পড়িল। হাস্ যখন পোপের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে কনস্ট্রান্স-এর সভায় ডাকিয়া আনাইয়া পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। হাস্-এর ভাগ্যে যাহা জুটিয়াছিল তাঁহার কপালেও তাহাই আছে মনে করিয়া লুথার রোমে গেলেন না। তখন তাঁহাকে খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়া এক ফতোয়া আসিল। লুথার জনতার সামনে এই ফতোয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন।



মার্টিন লুথার

খ্রীষ্টান সমাজের যত অসন্তোষ সব লুথারকে ঘিরিয়া দানা বাঁধিতে লাগিল। রোমান ক্যাথলিক-দের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিত বলিয়া লুথারের দলকে বলিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট। জার্মানী দুই দলে ভাগ হইয়া গেল। ১৫২১ সালে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওয়ার্মস্ নগরে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। লুথারের উপর হুকুম হইল যে এখানে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার বেয়াদবির কৈফিয়ত দিতে হইবে। এবার লুথার পিছাইলেন না। তিনি আসিয়া নির্ভীকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন

করিলেন আর বলিলেন যে তাঁহার একটি কথাও তিনি প্রত্যাহার করিবেন না। সম্মেলনে লুথারকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। জার্মানদের উপর নির্দেশ হইল কেহ তাঁহাকে এক ফোঁটা জল বা আশ্রয় দিবে না, কেহ তাঁহার লেখা এক বর্ণও পড়িবে না। কিন্তু ইতোমধ্যে লুথারের বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছে। যাহারা এরূপ অন্যায় আদেশের পরোয়া করে না। স্যাক্সনীর রাজন্য তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে বসিয়া লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন। এই অনুবাদ ছাপা হইয়া বাহির হইল, জার্মানরা পড়িল। ঈশ্বরের বাণী আর পোপ ও পাদরীদের সম্পত্তি রহিল না।

কেলভিনঃ জার্মানী হইতে আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে। কেল্‌ভিন নামে একজন ফরাসী সংস্কারক খ্রীষ্টধর্মের গুটিকতক মূলনীতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহারও বহু শিষ্য জুটিল। সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা নগরীর অধিবাসীরা তাহাদের পাদরী রাজাকে তাড়াইয়া গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। এখানে আসিয়া কেল্‌ভিন এক নূতন শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। সাংসারিক ও ধর্মীয় উভয় ব্যাপারে নগর-পরিষদ হইল সর্বময় কর্তা। জেনেভার নাম হইল 'ঈশ্বরের নগরী'। কেল্‌ভিন ঈশ্বরের মুখপাত্র হইয়া পরিষদের মারফত কঠোরভাবে নগরীর জীবনযাত্রা চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে দেখা দিল ক্যাথলিকদের মতই ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা। সার্ভেটাস্ নামে একজন স্পেনীয় বৈজ্ঞানিক ও যাজককে তিনি ধর্মদ্রোহের অপরাধে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন। লুথারও অনেক ক্ষেত্রে কেল্‌ভিনের মত গোঁড়ামির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার আগল একবার খুলিয়া গেলে আর বাঁধ মানে না;

লুথার ও কেল্‌ভিনের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ছাড়াও অনেক বিদ্রোহী ধর্মমত দাঁড়াইয়া গেল। এইরূপে রিফর্মেশন আন্দোলনের ভিতর বহু মত ও সম্প্রদায়ের উদয় হইল এবং পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিল।

ইংলণ্ড: ইংলণ্ডে রিফর্মেশন জন-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নাই। রাজা তাঁহার দেশে পোপের হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অষ্টম হেনরী লুথারের বিরুদ্ধে পোপকে প্রথমে সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাণীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার জন্য পোপের শরণাপন্ন হইলেন। এই রাণী ছিলেন পোপের রাজা পঞ্চম চার্লসের আত্মীয় আর চার্লস্‌ ছিলেন পোপের মস্ত বড় সহায়। চার্লস্‌কে চটাইয়া বিবাহবিচ্ছেদ করিতে পোপ সাহস পাইলেন না। ইহাতে হেনরীর সঙ্গে পোপের বিচ্ছেদ হইল। হেনরী পার্লামেন্টের সমর্থনে 'এ্যাক্ট অফ্‌ সুপ্রিমেসী' নামে এক আইন পাশ করিয়া (১৫৩৪) ইংলণ্ডের চার্চকে পোপের হাত হইতে মুক্ত করিলেন এবং নিজে ইহার কর্তা হইয়া বসিলেন। চার্চের ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি ল্যাটিন বাইবেলের বদলে ইংরাজী বাইবেলের প্রবর্তন করিলেন, মঠগুলি তুলিয়া দিলেন, সাধুদিগকে পেন্‌সন দিয়া মঠের টাকা আত্মসাৎ করিলেন। তারপর তিনি খ্রীষ্টীয় উপদেশ সঙ্কলন করিয়া 'ছয় ধারার আইন' নামে এক আইন পাশ করিলেন। কোন ক্যাথলিক হেনরীর কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে যেমন তাহার মৃত্যুদণ্ড হইত, তেমন কোন প্রোটেস্ট্যান্ট ছয় ধারার ধর্ম অমান্য করিলে তাহারও রক্ষা ছিল না। বাইবেল পড়িয়া কেহ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে গেলে তাহারও প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। কিন্তু বহু অত্যাচার করিয়াও হেনরী ইংলণ্ডে বিদ্রোহী ধর্মমত দমন করিতে পারেন নাই।

ত্রিকোণ দ্বন্দ্বঃ সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে রিফর্মেশন একটি ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব। এক দিকে পোপের সঙ্গে জনতার দ্বন্দ্ব। পোপ চান চার্চের ব্যবস্থা ও প্রভুত্ব কায়েম রাখিতে, জনতা চায় চার্চকে সংশোধন করিয়া সহজ ও পবিত্র করিতে। আর একদিকে পোপের সঙ্গে রাজাদের দ্বন্দ্ব। রাজারা চান পোপের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে, দেশের অর্থ পোপের হাতে না দিয়া নিজেদের হাতে রাখিতে। তৃতীয় দিকে রাজাদের সঙ্গে জনতার দ্বন্দ্ব। রাজারা প্রথমে স্বার্থসিদ্ধির জন্য জন-আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিলেন এবং স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনতার আন্দোলন ও স্বাধীন ধর্মমত দমন করিতে লাগিলেন। এ কাজে রিফর্মেশনের নায়করা তাঁহাদের সহায় হইলেন।

এই তিন পক্ষের দ্বন্দ্ব চলিল দীর্ঘকাল ধরিয়া। মধ্যযুগে পোপের ছত্রচ্ছায়ায় খ্রীষ্টীয় জগতে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। একশ' বছর ধরিয়া ইয়োরোপের বুকের উপর চলিল ধর্মযুদ্ধের তাণ্ডব। ধর্মের নামে যে নৃশংস ধ্বংসলীলার ও নরহত্যার অনুষ্ঠান হইল ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। শেষে ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিচুক্তিতে এই আত্মঘাতি হানাহানির অবসান হইল। ইয়োরোপের শিক্ষা হইল যে বাঁচিতে হইলে পরস্পরের ধর্মমত সহ্য করিতে হয়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় কেমন করিয়া বন্ধুভাবে একত্র বাস করিতে পারে সে শিক্ষা ভারতবর্ষ ও চীন প্রথম হইতে পাইয়াছিল। আর ইহা লাভ করিবার জন্য ইয়োরোপকে যে মূল্য দিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও দুঃখ হয়।

কালক্রম

ভৌগোলিক আবিষ্কার রিফর্মেশন		রিনাইসেন্স
	১৩৫০	পেট্রার্ক
		বোকাচিও
উইক্লিফ্		
	১৪০০	
হাস্-এর মৃত্যু ১৪১৫		
১৪৪৬		ছাপাখানা আবিষ্কার
	১৪৫০	
১৪৫৩		কনস্টান্টিনোপল্-এর পতন
কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার ১৪৯৪		
ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আবিষ্কার	১৫০০	লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
ইরাস্মাস		
লুথারের প্রতিবাদ ১৫১৭		
মাগেলানের পৃথিবী পরিক্রমণ ১৫২১		
ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম ১৫৩৪		
	১৫৫০	
		শেক্স্পীয়ার
	১৬০০	ব্রুনোর মৃত্যু
		গ্যালিলিও
ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি ১৬৪৮		
	১৬৫০	
		রুবেন্স, রেমব্রাণ্ট

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিস্তার

মধ্যযুগে পৃথিবীর অর্ধেক ছিল অজানা। পৃথিবীর আকৃতি এবং মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এই জ্ঞান লাভ হইল রিনাইসেন্স ও রিফর্মেশনের কালে। এ যুগের অন্যতম কীর্তি ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং দেশবিদেশে ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিস্তার।

পুরাকাল হইতে ইয়োরোপের বাজারে প্রাচ্য দেশের পণ্যের সমাদর ছিল। পণ্য চলাচল করিত ভূমধ্যসাগরের জলপথ এবং এশিয়া মাইনরের স্থলপথ ধরিয়া। কিন্তু ইয়োরোপীয়রা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর ছাড়াইয়া বেশী দূরে যায় নাই। ভারত, চীন ও মধ্য এশিয়া ছিল প্রায় অজ্ঞাত দেশ। ত্রয়োদশ শতকে মার্কো পোলো তাঁহার কাকা ও বাবার সঙ্গে এশিয়ার স্থলপথে চীনদেশ পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী লিখিলেন। রত্নগর্ভা রহস্যময়ী প্রাচী ইয়োরোপের চোখে নেশা ধরাইল।

ইতোমধ্যে তুর্করা আসিয়া এই দুই বাণিজ্যপথ আগলাইয়া বসিয়াছে। প্রাচ্যদেশে যাইবার জন্য নূতন পথ আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল।

সমুদ্রযাত্রা : নানাপ্রকারের লোক আগাইয়া আসিল। দুঃসাহসী যুবক আসিল অজানা দেশ ও দুর্গম পথের আকর্ষণে। ভাগ্যান্বেষীরা বাহির হইল সোনাদানার লোভে। ধর্মপ্রচারক ছুটিল যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিতে। কিন্তু কেবল সাহস ও

আগ্রহ থাকিলেই হয় না, একাজে ভূগোলের জ্ঞান ও নৌবিদ্যার দরকার। আরব ও গ্রীকরা এ বিদ্যা কিছু কিছু জানিত, গ্রীকরা এ সম্বন্ধে কিছু বইও লিখিয়াছিল। তুর্ক আক্রমণের ভয়ে যখন ওদেশের পণ্ডিতরা পশ্চিম দিকে পলাইয়া আসিলেন তখন এই সমস্ত বই তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া পশ্চিমবাসীদের হাতে পড়িল। ইয়োরোপের নাবিকরা জানিল পৃথিবী চ্যাপ্‌টা নয়, গোলাকার। আর পাইল সমুদ্রের মাপজোখ, মানচিত্র, দিক নির্ণয়ের কম্পাস ইত্যাদি সমুদ্রযাত্রার সরঞ্জাম।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের বাণিজ্যলক্ষ্মী ছিলেন ইটালীর আশ্রয়ে। তাঁহার পাদপীঠ ছিল ভূমধ্যসাগর। প্রাচ্যের রত্ন-ভাণ্ডার আসিয়া নামিত ভেনিস ও জেনোয়া নগরীর ঘাটে। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথ বন্ধ হইবার পর ইহাদের কপাল পুড়িল। নূতন পথ আবিষ্কারের কাজে অগ্রণী হইল অতলান্ত সমুদ্রের তীরবর্তী দুই পাশ্চাত্ত্য দেশ —স্পেন ও পর্তুগাল। এই দুই দেশের রাজারা অর্থ, জাহাজ ও লস্কর দিয়া অভিজ্ঞ ইতালীয় নাবিকদের সামুদ্রিক অভিযানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের চেষ্টায় নূতন নূতন দেশ ও জলপথ আবিষ্কৃত হইল। বাণিজ্যলক্ষ্মী ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়া আসিলেন অতলান্ত মহাসাগরের তীরে।

স্পেন ও পর্তুগালের দক্ষিণ অংশ মূর নামক এক মুসলমান জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। এই দুই দেশের সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। মূরদের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য তাঁহাদিগকে নৌবল বাড়াইতে হইয়াছিল। অবশেষে মূরদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া স্পেনীয় ও পর্তুগীজরা আত্মবিশ্বাস লাভ করিল, তাহাদের বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল।

কিন্তু ভৌগোলিক ও সামুদ্রিক তথ্য কিছু কিছু বাহির হইলেও তখন সমুদ্রযাত্রা ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। অতলান্ত মহাসাগরের তল ও অন্ত নাই—ইহা পাড়ি দিতে গিয়া কত লোক যে প্রাণ হারাইয়াছে তার হিসাব নাই। সে সময় সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল ফেরি বোটের মত ছোট, মাসের পর মাস তাহাতে কাটাইতে হইত। সঙ্গের রসদ হয়ত ফুরাইয়া কিংবা পচিয়া গিয়াছে, পানীয় জলে পোকা ধরিয়াছে, তাজা সব্‌জির অভাবে লোকদের স্কার্ভি রোগ ধরিয়াছে,—কিন্তু চারিদিকে শুধু জল, কোথাও ডাঙার চিহ্নমাত্র নাই। এত বিপদ মাথায় লইয়া কে সমুদ্রে পা বাড়াইবে? ভাগ্যান্বেষী বণিক ও ইটালীয় নাবিকরা অবশ্য ঝুঁকি লইত, কিন্তু জাহাজের লস্কর সংগ্রহ হইত কয়েদী, খুনী ও গুণ্ডাদের ভিতর হইতে।

অভিযানের লক্ষ্য ছিল চীন, ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-পুঞ্জ। শেষোক্ত অঞ্চল হইতে ভারতীয় ও আরবরা ইয়োরোপে চালান দিত এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ। খাবার মসলার উপর ছিল ইয়োরোপীয়দের বড় লোভ। তাহারা 'মসলা দ্বীপের' সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। পর্তুগালের জাহাজ ধরিল পূর্ব দিক্‌, স্পেনের জাহাজ গেল পশ্চিম দিকে। পৃথিবী গোলাকার, তাই দুই পথ আসিয়া একই জায়গায় মিলিবে।

পর্তুগাল: ১৪১৫ সালে পর্তুগীজরা আফ্রিকায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরী এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার সমুদ্রযাত্রার বাতিক ছিল বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত 'নাবিক হেনরী'। তিনি চাহিয়াছিলেন সমুদ্রপথে আফ্রিকা ঘুরিয়া পূর্ব দিকে যাইবার রাস্তা বাহির করিতে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে বৈজ্ঞানিক আনাইয়া তিনি পর্তুগীজ নাবিক-

দিগকে নৌবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। ১৪৮৬ সালে বার্থলমিউ ডিয়াজ্ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ পার হইলেন। পথে ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহার নাম দিলেন 'তুফান অন্তরীপ'। কিন্তু পর্তুগালের রাজা এই সফল যাত্রায় আশার আলো দেখিতে পাইয়া ইহার নাম দিলেন 'কেপ অফ্ গুড হোপ' বা 'উত্তমাশা অন্তরীপ'।

বার বছর পরে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। ভাস্কো-ডা-গামা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছাইলেন এবং বহু মসলা ও অন্যান্য জিনিস লইয়া দেশে ফিরিলেন। মসলার ব্যবসা যে সহজে হাত করা যাইবে না তাহাও তিনি জানাইলেন। পর্তুগীজ সরকার প্রথমে ভারতবর্ষে ঘাটি করিলেন, সেখানে সুদক্ষ সেনাপতিদিগকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। পর্তুগীজ লাট আল্‌বুকর্ক পূর্বদিকে ক্ষমতা বিস্তার করিলেন এবং আরবদিগকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্যবসা হস্তগত করিলেন। ১৫১১ সালে মসলাদ্বীপ তাঁহার পদানত হইল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্তুগীজ উপনিবেশে পরিণত হইল এবং মসলার বাণিজ্য পর্তুগীজরা একচেটিয়া করিয়া লইল।

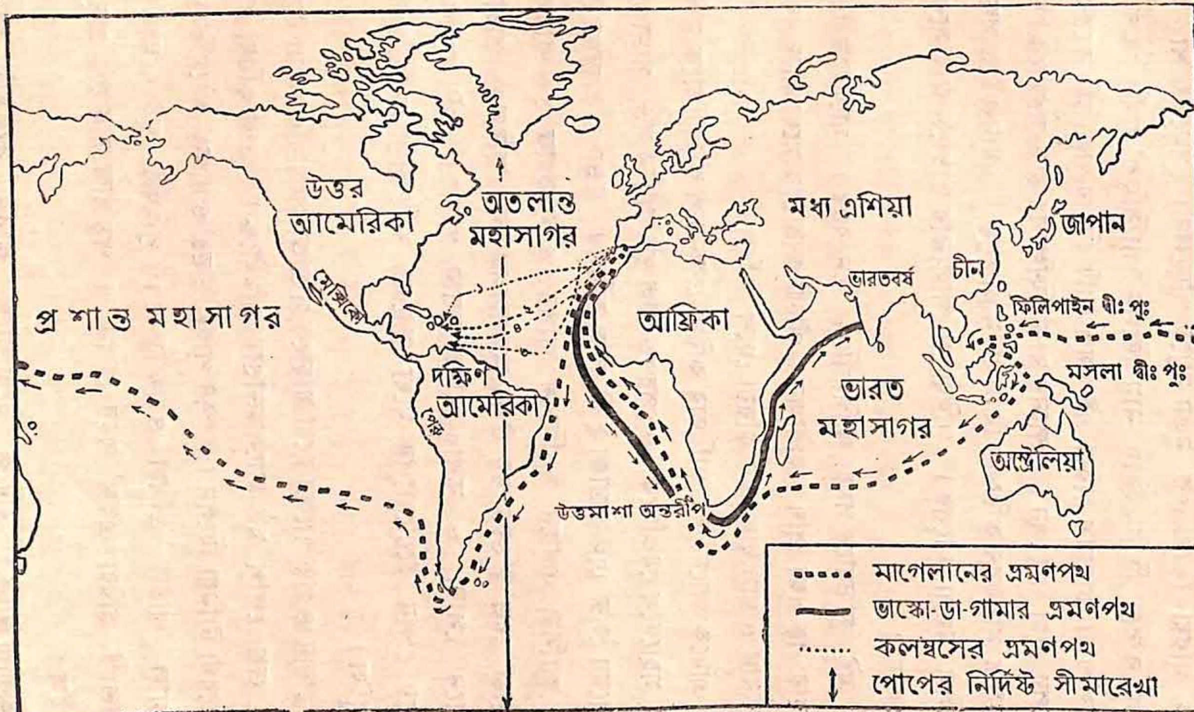


ভাস্কো-ডা-গামা

স্পেন ঃ আর একজন নাবিক স্পেনের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাহির হইলেন অতলান্ত সাগর দিয়া পশ্চিম দিকে। রাজাদের ধারণা ছিল যে এই সাগর পার হইলেই মিলিবে এশিয়া। মধ্যে যে আর একটা মহাদেশ ও মহাসাগর আছে তা তাঁহারা জানিতেন না। ১৪৯৪ সালে স্পেন-সরকার কলম্বসকে তিনটি জাহাজ ও আটাশি জন লোক দিয়া এই পথে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে পাঠাইলেন। উনসত্তর দিন পরে স্থলের দেখা মিলিল। কলম্বস ভাবিলেন তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছেন। আসলে ইহা ছিল আমেরিকার সংলগ্ন একটি দ্বীপ। কলম্বস আরও চারবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া আমেরিকায় অবতরণ করেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার ভুল ভাঙে নাই। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে তিনি বলিতেন রেড ইণ্ডিয়ান, কারণ তাহাদের গায়ের রং লালচে। তাঁহার পরে আমেরিগো ভেস্‌পুচি নামে আর একজন নাবিক আমেরিকায় উপস্থিত হন। তখন বোঝা গেল এ এক নূতন মহাদেশ এবং তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইল। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমেরিকা ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে যাইবার কোন জলপথ বাহির হয় নাই।


কলম্বস

তারপর মাগেলান নামে এক পর্তুগীজ নাবিক পাঁচখানি স্পেনীয় জাহাজ লইয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। ১৫১৯ সালে রওনা হইয়া তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় আসিলেন। ইহার দক্ষিণ


উত্তর আমেরিকা
অতলান্ত মহাসাগর
মধ্য এশিয়া
জাপান
চীন
ভারতবর্ষ
মেক্সিকো
প্রশান্ত মহাসাগর
আফ্রিকা
ফিলিপাইন দ্বীঃ পুঃ
মসলা দ্বীঃ পুঃ
দক্ষিণ আমেরিকা
পেরু
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
উত্তমাশা অন্তরীপ
মাগেলানের ভ্রমণপথ
ভাস্কো-ডা-গামার ভ্রমণপথ
কলম্বসের ভ্রমণপথ
পোপের নির্দিষ্ট সীমারেখা

দিক ঘুরিয়া তিনি এক নূতন সমুদ্রে পড়িলেন। সমুদ্রের শান্তভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহার নাম দিলেন 'প্যাসিফিক' অর্থাৎ 'প্রশান্ত' মহাসাগর। চারমাস ধরিয়া এই সমুদ্র পাড়ি দিবার পর তিনি কয়েকটি দ্বীপের দেখা পাইলেন। স্পেনের রাজা ফিলিপের নাম অনুসারে তিনি ইহাদের নামকরণ করিলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। এখান হইতে সন্ধান মিলিল মসলা দ্বীপের। পৃথিবী যে গোলাকার তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

এই অভিযানে সময় লাগিয়াছিল তিন বছর। মাগেলান এবং তাঁহার বহু সঙ্গী প্রাণ হারাইলেন। পাঁচটি জাহাজের মধ্যে মাত্র একটি সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ বহন করিয়া দেশে ফিরিল।

এদিকে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্পেন চুপ করিয়া থাকে নাই। এই মহাদেশে মেক্সিকো ও পেরুতে ছিল দুই প্রাচীন সভ্য সাম্রাজ্য। স্পেনের সৈন্য এই সাম্রাজ্য দু'টি ধ্বংস করিল। দস্যু ও ভাগ্যান্বেষীর দল আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন ও লুঠতরাজ শুরু করিল। তাহারা রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। তাহারা এখানে সোনা ও রূপার খনির সন্ধান পাইল। এই সম্পদের জোরে স্পেন ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইল।

স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যাহাতে সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ না বাধে সেই জন্য পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার পৃথিবীকে দুই ভাগ করিয়া এক সীমারেখা টানিয়া দিলেন। স্পেন পাইল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; পর্তুগাল পাইল এশিয়া ও আফ্রিকা। পৃথিবীটা দুই এলাকায় ভাগাভাগী করিয়া একশ' বছর স্পেন ও পর্তুগাল তাহাদের প্রভুত্ব চালাইল।

অন্যান্য জাতি ঃ এদিকে ইয়োরোপে আরও কয়েকটি জাতি

নৌবিদ্যা ও নৌবল অর্জন করিল। পোপের ফতোয়ার কতটুকু বা দাম! তাহাদেরও লুঠের ভাগ চাই। ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা পর্তুগীজদের পথ ধরিয়া আসিল ভারতবর্ষে ও এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে। অবশেষে পর্তুগীজদের সুদূর-প্রসারিত প্রাচ্য সাম্রাজ্য তাহাদের দখলে আসিল। ভারতবর্ষে গোয়া, দমন, দিউ এমন কয়েকটিমাত্র বন্দর ও গ্রাম পর্তুগীজদের অধিকারে রহিল। স্পেনের হাতে রহিল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ লইল ওলন্দাজরা, ইংরাজরা দখল করিল ভারতবর্ষের উপনিবেশ। ইতোমধ্যে আবার ফরাসীরা আসিয়া ভারতবর্ষে ভাগ বসাইল। এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরাসীরা ইন্দোচীনে ঘাটি করিল। ভারতবর্ষে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর ও গুটিকয়েক শহর ও গ্রাম ছাড়া তাহাদের কিছু রহিল না।

স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের এই সামুদ্রিক উদ্যম ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ইহাদের অধিকাংশই ছিল দস্যু ও অর্থলোভী বিবেকহীন বণিক। এশিয়ার ও আমেরিকার শান্তিপূর্ণ জাতিগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া কিংবা শোষণ করিয়া ইহারা নিজেদের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিত। ইহাদের পিছনে পিছনে যে ধর্মপ্রচারকরা আসিত তাহারা কিছু কিছু জনহিতকর কাজ করিলেও ইহাদের নিষ্ঠুরতা বন্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সভ্যতার দিক দিয়া এই সামুদ্রিক উদ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-বিদেশের মাঝে মহাসমুদ্রের ব্যবধান দূর হইল। বাণিজ্যের বন্ধনের মধ্য দিয়া সারা পৃথিবীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আর ইয়োরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাতসমুদ্র পার হইয়া এশিয়া ও আমেরিকার দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

ইয়োরোপের সভ্যতা যখন রিনাইসেন্স ও রিফর্মেশনের ভিতর দিয়া নবজন্ম লাভ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষে আফগান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া এক নূতন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচিত হইতেছিল। এই সাম্রাজ্যের স্রষ্টা মোঙ্গল বা মুঘল জাতি,—তুর্কীদের এক শাখা।

সাম্রাজ্যের সূচনা, বাবর ঃ চিঙ্গীজ খাঁ ও তাইমুরের পর ভারতবর্ষের উপর নজর পড়িল আর এক মোঙ্গল যোদ্ধার। বাবর ছিলেন পিতার দিক দিয়া তাইমুরের এবং মাতার দিক দিয়া চিঙ্গীজের বংশধর। এগার বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সমরকন্দের সিংহাসনে বসিলেন। অল্প কালের মধ্যেই তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইল। অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি কাবুল জয় করেন এবং শেষে দিল্লী-সুলতানের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে দিল্লীর স্থলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় হইল। ইহার পর খানুয়ার যুদ্ধে রানা সঙ্গ ও রাজপুতবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া বাবর দিল্লীতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কাবুল হইতে বিহারের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত সিন্ধু ও গঙ্গা উপত্যকা তাঁহার অধিকারে আসিল।



বাবর

হুমায়ুন ও শেরশাহ্ ঃ বাবর যেমন ছিলেন সমরকুশল তেমন ছিলেন রুচিসম্পন্ন। তিনি শিল্প, সাহিত্য, ফুল ও বাগিচা খুব ভাল বাসিতেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকেও তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত করিয়া গড়িয়াছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন পিতার শৌর্য ও ব্যক্তিত্ব পান নাই। তিনি ভাইদের হাতে এক এক অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইল।

সুযোগ বুঝিয়া ১৫৩৯ সালে শের খাঁ নামে একজন আফগান সর্দার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিলেন। তিনি শের শাহ্ নাম গ্রহণ করিয়া পাঁচ বছর সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করিলেন। যুদ্ধে কিংবা শাসনবুদ্ধিতে তিনি বাবরের চেয়ে কম ছিলেন না। শাসনবিভাগ, বিচার, পুলিশ, সেনা, ভূমিরাজস্ব, মুদ্রা ও শুল্ক, পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি নানা দিক্ দিয়া তিনি নূতন বিধি ও সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা পরে অনেকাংশে আকবরের আমলে গৃহীত হইয়াছিল।

এদিকে হুমায়ুন পনের বছর এখানে সেখানে পলাইয়া ফিরিলেন। পথে রাজপুতনার মরুভূমিতে তাঁহার এক পুত্র হইল। এই পুত্রই আকবর। শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন আসিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসন সুদৃঢ় করিবার আগেই তিনি একদিন প্রাসাদের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইলেন।

সাম্রাজ্যের বিস্তার, আকবর ঃ ১৫৫৬ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে আকবর সিংহাসনে বসিলেন। তখনও সম্পূর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য উদ্ধার হয় নাই। চল্লিশ বছর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রায় সারা উত্তর ও মধ্য-ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। অনেক হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিল। অনেকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিলেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী, আহম্মদনগরের

রাণী চাঁদবিবি ও মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের নাম তাঁহাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। আকবরের ছিল উদার হৃদয় এবং তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি। যুদ্ধে পরাজিত হিন্দু রাজাদিগকে তিনি উদার আচরণ দ্বারা বশ করিলেন। যোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ রাজপদ দিয়া, জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া এবং রাজপুত রাজন্যদিগকে মুঘল পরিবারের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তিনি হিন্দুদের হৃদয় জয় করিলেন, সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন।


আকবর

আকবর তাঁহার সভায় ও রাজকাজে বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ করিয়াছিলেন। মন্ত্রী ফৈজী ও আবুল ফজল, সেনাপতি মানসিংহ, রাজস্বসচিব তোডর মল, সুগায়ক তানসেন এবং সুরসিক বীরবল তাঁহার সভা ও সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। শোনা যায় আকবর লেখাপড়া জানিতেন না,—কিন্তু অন্যের পাঠ ও আলোচনা শুনিয়া তিনি বহু জ্ঞান অর্জন করেন। মুসলমান হইয়াও তিনি সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করিতেন। সকল ধর্মের সারতত্ত্ব লইয়া তিনি 'দীন-ই ইলাহী' নামে এক নূতন মত প্রচার করেন, কিন্তু কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। তিনি ছিলেন সাহসী, মিতাচারী, প্রজাবৎসল, পরিশ্রমী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার মত শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহানুভব সম্রাট অল্পই দেখা যায়।

জাহাঙ্গীর—১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ, কোচবিহার, মেবার ও আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সময়ে পর্তুগীজরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দেশবাসীদের উপর নানারূপ অত্যাচার শুরু করে। জাহাঙ্গীর তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। রাজকাজে জাহাঙ্গীরের উপর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর অত্যন্ত প্রভাব ছিল। অপূর্ব রূপসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল নূরজাহান বা 'জগতের আলো।' জাহাঙ্গীরের চরিত্রে অনেক গুণ ছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ, পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল ও শিল্পসাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মস্ত বড় দোষ ছিল অত্যধিক সুরাপান এবং আকস্মিক বর্বরতার প্রকাশ। মুঘল সম্রাট্‌দের চরিত্র হইতে মোঙ্গল রক্তের বৈশিষ্ট্য কখনও একেবারে লোপ পায় নাই।



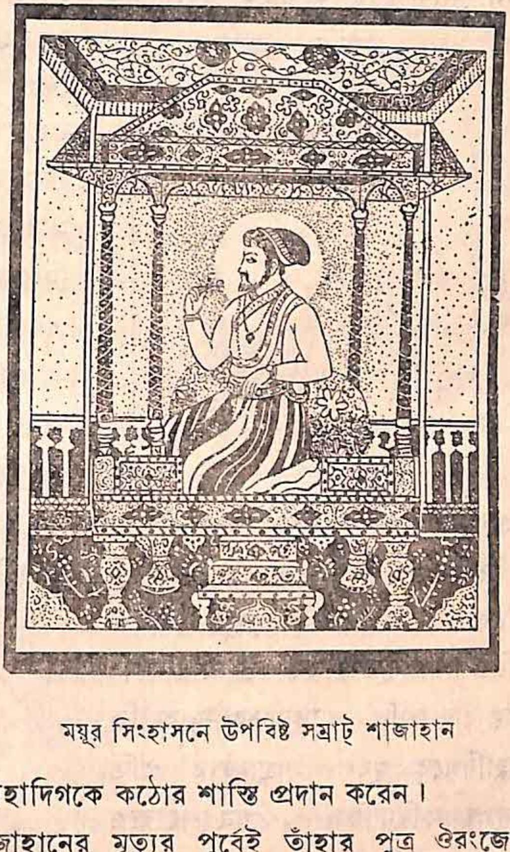
জাহাঙ্গীর

শাজাহানঃ—জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাজাহান এই জাতিধর্ম সপ্রমাণ করিলেন। সব কয়টি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া তিনি সম্রাট্ হইলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহান—প্রত্যেকের মৃত্যুর পূর্বে এবং পরে পিতা-পুত্রে ও ভাই-এ ভাই-এ যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড হইয়াছে।

শাজাহানের আমলে সাম্রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা লইয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি যুদ্ধজয়ের জন্য নয়, শিল্প ও স্থাপত্যের জন্য। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের কবরের উপর তিনি তাজমহল নামে যে মর্মর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আজও


ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য সীমা
ঔরংজেবের সাম্রাজ্যসীমা
পেশাওয়ার
গজনী
কাশ্মীর
পানিপথ
দিল্লী
রাজপুতনা
হিমালয় পর্বত
আসাম
বিহার
কুচবিহার
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
কাশী
পাটনা
গৌড়
মেবার
চিতোর
আমেদাবাদ
উজ্জয়িনী
বুন্দেলখণ্ড
বিন্ধ্য পর্বত
ইন্দোর
গণ্ডোয়ানা
বঙ্গদেশ
গুজরাট
খান্দেশ
সুরাট
নাগপুর
চট্টগ্রাম
ঔরঙ্গাবাদ
বোম্বাই
আমেদনগর
বিদর
বিজাপুর
গোলকুণ্ডা
মসুলিপট্টম
মাদ্রাজ
ভা র ত
ম হা সা গ র
সিংহল

পৃথিবীর এক অতুলনীয় বিস্ময়। দিল্লী ও আগ্রা তিনি মসজিদ ও ইমারতে ছাইয়া ফেলিয়া ছিলেন। ইহার প্রত্যেকটিই মুঘল নির্মাণ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। হিন্দুদের উপর কিছু কিছু উৎপীড়ন করিলেও শাজাহান তাঁহার ত্রিশ বছরের রাজত্বে মোটামুটি শান্তি ও সুশাসন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পর্তুগীজদের ঘাঁটি হুগলী দখল করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।



ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট্ শাজাহান

ঔরংজেব : শাজাহানের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার পুত্র ঔরংজেব পিতাকে বন্দী করিয়া এবং ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার পঞ্চাশ বছরের রাজত্ব যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তিতে পূর্ণ।

ঔরংজেব পূর্বদিকে আসামরাজ ও আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দারাং, চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দ্বীপ লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গিয়া আফ্রিদি বিদ্রোহ দমন করিলেন। এ অঞ্চলে

আফগানরা তাঁহার প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। এদিকে শাসনকার্যে তিনি আকবরের প্রবর্তিত উদারনীতি বিসর্জন দিয়া চরম সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিলেন। হিন্দু-দের উপর তিনি জিজিয়া কর বসাইলেন, হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদ হইতে অপ-সারণ করিলেন। ফলে চারি-দিকে অসন্তোষ শুরু হইল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল।



ঔরংজেব

এই বিদ্রোহী শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান। পঞ্জাবের শিখরা পঞ্চদশ শতকে ছিল গুরু নানকের অনুবর্তী ধর্মসম্প্রদায়। জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও ঔরংজেবের অত্যাচারের ফলে তাহারা একটি সামরিক জাতিতে পরিণত হইল এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাজপুতরা স্বভাবতঃ স্বাধীনতা-প্রিয় বীর জাতি। আকবরের উদারনীতি তাহাদিগকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল। এখন তাহারাও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অনিষ্ট করিল মারাঠারা। এই ছোট পার্বত্য জাতি শিবাজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্র স্থাপন করিল।



শিবাজী

এবং ক্ষীয়মাণ মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব করিতে লাগিল।

ঔরংজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য, বিলাসিতা ও সুরাপান বর্জন করিয়া ফকিরের ন্যায় বাস করিতেন। তিনি ছিলেন সমর কুশল, চতুর, সাহসী ও পরিশ্রমী। কিন্তু তাঁহার মন ছিল সঙ্কীর্ণ। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সকলের উপর অবিশ্বাস লইয়া ভারতবর্ষের মত বহু জাতি-ধর্মের বিরাট দেশ শাসন করা যায় না। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্য যখন ঔরংজেবের আমলে চরম বিস্তৃতি লাভ করিল ঠিক তখনই খান খান হইয়া ভাঙিতেও আরম্ভ করিল।

১৭০৭ সালে ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিন পুত্র পিতৃদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সন্তানরাও এই যুদ্ধের ধারা অব্যাহত রাখিলেন। দিল্লীর মসনদে ভোজ-বাজির মত বাদ্‌শাহদের আনাগোনা চলিল। তাঁহাদের অক্ষমতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন হইয়া বসিলেন। হায়দ্রাবাদ, বাংলা ও অযোধ্যা দিল্লীর শাসন হইতে মুক্ত হইল। জাঠ ও আফগানরা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিল। আর মারাঠারা মালোয়া, গুজরাট ও ইন্দোর অধিকার করিয়া উত্তরপূর্ব গোয়ালিয়র, নাগপুর, ও বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত দখল করিয়া বসিল। মনে হইল বুঝিবা তাহারাই মুঘলদের উত্তরাধিকারী হইয়া বসিবে।

সাম্রাজ্যের পতন ঃ বাবর ও আকবরের সঙ্গে শাজাহান ও ঔরংজেবের তুলনা করিলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সহজেই অনুমিত হয়। প্রথমতঃ অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমনের যুদ্ধ, রাজ-পরিবারের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ। ইহার উপর ছিল সম্রাটদের বিলাসিতা ও সৌধ নির্মাণের ব্যয়। দ্বিতীয় কারণ, মুঘলরা তাহাদের মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে অঞ্চল হইতে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল-বাহিনী লইয়া বাবর হিন্দুস্থান জয় করিয়াছিলেন পরে তাহা পারসীক

ও উজবেকদের কবলে চলিয়া যায়। সীমান্ত-প্রদেশের আফগানদিগকেও ঔরংজেব চটাইয়া দেন। ভারতীয়দের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আর আফগান ও মোঙ্গল সৈন্য জুটিল না।

ইহাতে কোন ক্ষতি হইত না যদি ঔরংজেব আকবরের প্রবর্তিত নীতি পালন করিতেন। আকবর তাঁহার হৃদয়ের গুণ ও রাজনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা শত্রুকে মিত্র করিতে জানিতেন। কী যুদ্ধক্ষেত্রে, কী রাষ্ট্র-শাসনে, সর্বত্র তিনি রাজপুতদের আনুগত্য ও সহায়তা লাভ করিতেন। আকবরের শাসনকে এ দেশের লোক বিদেশী শাসন বলিয়া মনে করিত না। ঔরংজেব তাঁহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির দোষে দেশবাসীদের মনে ভালবাসা হারাইলেন। তিনি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, কাহাকেও ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এত বড় সাম্রাজ্য এভাবে শাসন করা যায় না। ইহার ফলে যোগ্য মুসলমান সচিব ও সেনাপতিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মুঘল সাম্রাজ্য এক অত্যাচারী বিজাতীয় শাসনরূপে সকলের বিরক্তিভাজন হইল। তাই জাঠ, শিখ, রাজপুত এবং মারাঠা বীরদিগকে দেশবাসী মুক্তিদাতা বলিয়া সংবর্ধনা করিল।

সর্বশেষ কারণ, মুঘলদের চারিত্রিক অবনতি। বাদশাহ্ ও আমীর-ওমরাহরা বিলাসব্যসনে গা ঢালিয়া দিয়া আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবর তাঁহার অভিযানের পথে সাঁতরাইয়া নদী পার হইতেন আর শাজাহান ও ঔরংজেবের সময়ে আমীরদের জন্য যানবাহন লাগিত। মুঘল ফৌজের সঙ্গে যাইত অগণিত বিলাসপণ্য এবং অন্তঃপুরিকার দল, সব মিলিয়া যেন একটি চলমান শহর। মারাঠাদের মত ক্ষিপ্র পার্বত্য যোদ্ধাদের সামনে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিত না।


নাদির শাহ

এমন সময়ে ১৭৩৯ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন। হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করিয়া নগরীর ধনদৌলত লুঠ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া আফগান সর্দার আহ্‌ম্মদ শাহ আবদালী দিল্লী পর্যন্ত আসিয়া কয়েকবার লুঠতরাজ করিয়া গেলেন। হতবীর্য মুঘল বাদশাহী তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শাসনবিধি : মুঘল বাদশাহ্‌রা সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য এক সুন্দর শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ্ ও আকবর। ইহার সহিত বর্তমান শাসন-প্রণালীর কোন কোন বিষয়ে মিল আছে ও কোন কোন বৈশিষ্ট্য এখনকার শাসনব্যবস্থাতেও চলিয়া আসিয়াছে।

শাসনকার্যের ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য বারটি প্রদেশে বা সুবায় ভাগ করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের পর সুবার সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছিল। সুবার শাসনভার এক এক জন সুবাদারের হাতে দেওয়া হইত। তিনি সামরিক ও অসামরিক দুই বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মত তাঁহার অধীনেও বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য একদল কর্মচারী থাকিত। ইংরেজ আমলেও ভারত সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং ছোটলাট্‌রা প্রদেশ শাসন করিতেন, তবে সামরিক বিভাগে তাঁহাদের হাত ছিল না। আজকাল প্রদেশের নাম হইয়াছে রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকার হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্র।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা শের্‌শাহ্ ও তোডরমলের কীর্তি। তোডরমল এক মাপের গজকাঠি প্রবর্তন করিয়া তাহার দ্বারা সমস্ত জমি জরিপ করাইলেন, জমিকে উর্বরতা অনুসারে চার ভাগে ভাগ করিয়া কর ধার্য করিলেন। শ্রেণী অনুসারে জমির ফলন অনুমান করিয়া তাহার এক তৃতীয়াংশ খাজনা লওয়া হইত। রায়তরা ইচ্ছামত টাকায় বা

ফসলে সরাসরি রাজসরকারের খাজনা দাখিল করিত ; ইহাকে বলে রায়ত-ওয়ারি ব্যবস্থা। ইংরাজ আমলে অধিকাংশ প্রদেশে এই ব্যবস্থা বহাল ছিল এবং এখন ইহা সকল ভারতীয় রাজ্যে চালু হইতেছে।

কাজী ছিলেন বিচারপতি। প্রধান কাজীর অধীনে ছিলেন সুবার কাজী। শহরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন কোতোয়াল, জেলায় ফৌজদার। তাঁহাদের নীচে ছিল অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী। বিচার ও পুলিশ বিভাগেও মুঘল ও বর্তমান শাসনে সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশ্য এখনকার শাসন হইতে মুঘল শাসনের পার্থক্যও বিস্তর। তখনকার সরকারকে এখনকার মত এত দিককার কাজ দেখিতে হইত না। বৈদেশিক দপ্তরের কাজ ছিল অনেক কম, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। আজকাল সরকারকে এইসব দেখিতে হয়। তারপর মুঘল আমলে বাদশাহ্ ছিলেন সব কিছুর মালিক, এখনকার মত মন্ত্রিসভা ছিল না। মন্ত্রী বা উজীর ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা বাদশাহের ইচ্ছাধীন ছিল। আজকাল জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিসভাই কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসন পরিচালনা করেন।

সুবারউচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যাহাতে একজোট হইয়া কেন্দ্রের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি করা হইত। শাসনকর্তা, সুবাদার, অর্থ ও রাজস্বের মন্ত্রী দেওয়ানের উপর হুকুম ছিল পরস্পরের উপর নজর রাখিবার, যাহাতে কেহই বেশী ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে না পারেন। গ্রামের শাসন ছিল নামেমাত্র সুবার অধীন। গ্রামের প্রধান পঞ্চায়েতের সাহায্যে বিচার, সালিসী ও শান্তিরক্ষা করিতেন।

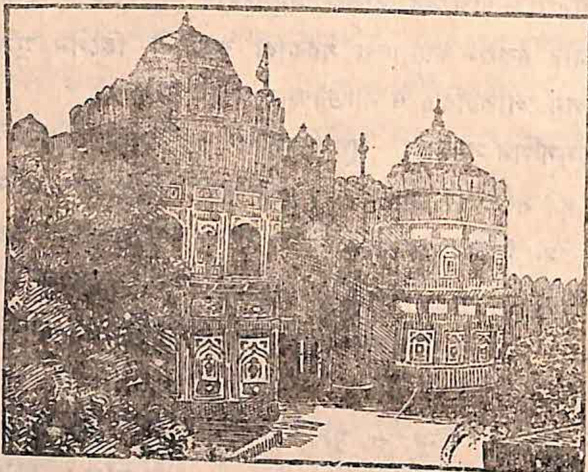
সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ছিলেন সেনানায়করা। ইহাদিগকে বলিত মন্‌সবদার। ইহারা ছিলেন বাদশাহের কর্তৃত্বাধীন। ইহারা পদমর্যাদা অনুসারে বেতন পাইতেন, বেতন হইতে ইহাদিগকে নির্দিষ্ট সংখ্যক হাতি,

ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতি রাখিতে হইত। বেতন সব সময়ে অর্থ দিয়া দেওয়া হইত না। কখন কখন অর্থের বদলে দেওয়া হইত জায়গির বা জমিদারি। জায়গিরের রাজস্ব মন্‌সবদার পাইতেন। বাদশাহের অধীনে আর একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন মুতাসিব। তিনি ছিলেন লোকচরিত্র ও নীতিরক্ষার অধিকর্তা।

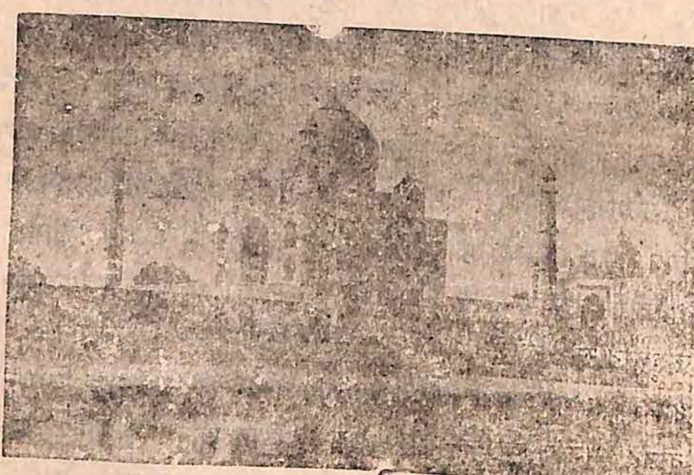
হিন্দুমুসলিম সমন্বয়ঃ মুঘল যুগের এক মহান কীর্তি হিন্দু ও মুসলমান দুই সংস্কৃতির ক্রমমিলন। এ সময়কার শিল্পে স্থাপত্যে সঙ্গীতে সাহিত্যে এমন কি ধর্ম আচরণেও সমন্বয়ের ধারা লক্ষিত হয়। আগ্রার দুর্গ ও তাজ, ফতেপুর সিক্রির রাজপ্রাসাদ, দিল্লীর লালকেল্লা ও জুম্মা মসজিদ এবং সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ এ যুগের নির্মাণ-শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। এই সমস্ত কেল্লা, মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধি ও তোরণের নির্মাণে হিন্দু ও মুসলিম শিল্পশাস্ত্র সমানভাবে প্রেরণা জোগাইয়াছে। চিত্রকলায় চীন-পারসীক ধারার সঙ্গে ভারতীয় ধারা মিশিয়া এক নয়া অঙ্কনপদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আগ্রহে মুঘল চিত্রকলা দ্রুত উন্নতি লাভ করিল। তাঁহাদের দরবারে হিন্দু ও মুসলিম চিত্রকররা সমান অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিতেন। শাজাহানের টান ছিল স্থাপত্যের উপর। মণিমাণিক্যখচিত ময়ূর সিংহাসন তাঁহার আমলের ঐশ্বর্য ও শিল্পসম্পদের অন্যতম নিদর্শন। সঙ্গীতে আসিয়া মিলিল হিন্দু ও মুসলিম ধারা। ভারতীয় ও পারসীক সুর মিশিয়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমর্থনে এক নূতন সঙ্গীতকলার সৃষ্টি হইল। ইহার অন্যতম শিল্পী ছিলেন তানসেন।

ধর্ম এবং সাহিত্যও এই সমন্বয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। আকবরের আমলে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়—যেমন অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের কোন কোন পর্ব, লীলাবতীর গণিত। শাজাহানের পুত্র দারা শুকো উপনিষদ, গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ

রামায়ণের অনুবাদ করেন। অনেক হিন্দু লেখকও ফারসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেন। হিন্দী সাহিত্যের চর্চাও কম হইত না। ষোড়শ



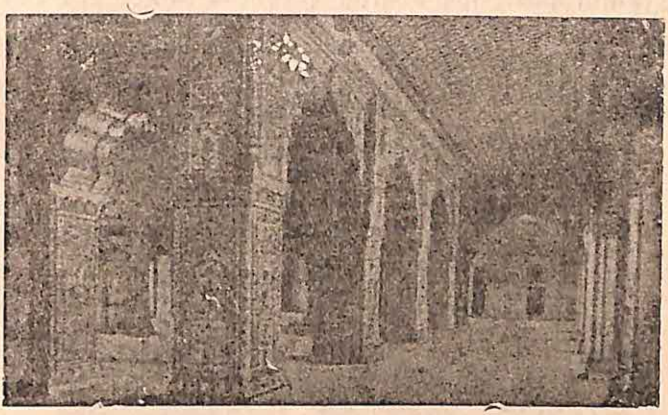
আগ্রা দুর্গ



তাজমহল

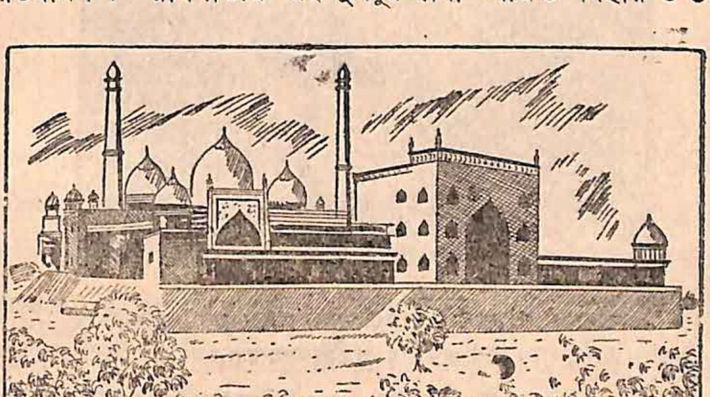
ও সপ্তদশ শতককে বলা হয় হিন্দুস্থানী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। আগ্রার

অন্ধকবি সুরদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়া ব্রজভাষায় অমর গীতিকাব্য 'সুরসাগর' রচনা করিলেন। তুলসীদাস লিখিলেন 'রাম-



দেওয়ান-ই-খাস

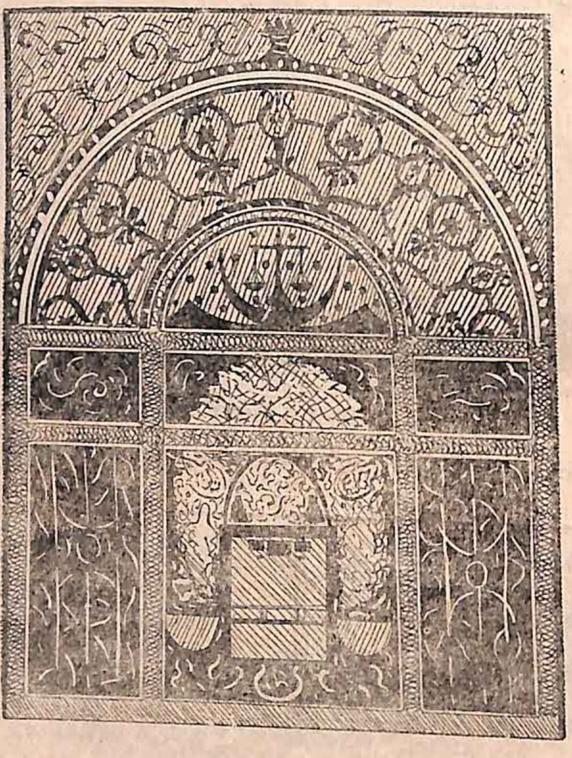
চরিতমানস'। রামসীতার এই সুমধুর গাথা আজও বিহার ও উত্তর



জুম্মা মসজিদ—দিল্লী

প্রদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। বাংলাভাষায় বিকাশ হইল বৈষ্ণব পদাবলীর। ধর্মের আচরণে হিন্দু ও মুসলমান এখনকার মত একেবারে

পৃথক হইয়া থাকিত না। মুসলমানরা শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিত, হোলির উৎসবে ও শারদীয়া পূজায় যোগ দিত, আবার হিন্দুরা সবুজ পোশাক পরিয়া মোহরমের মিছিলে বাহির হইত।

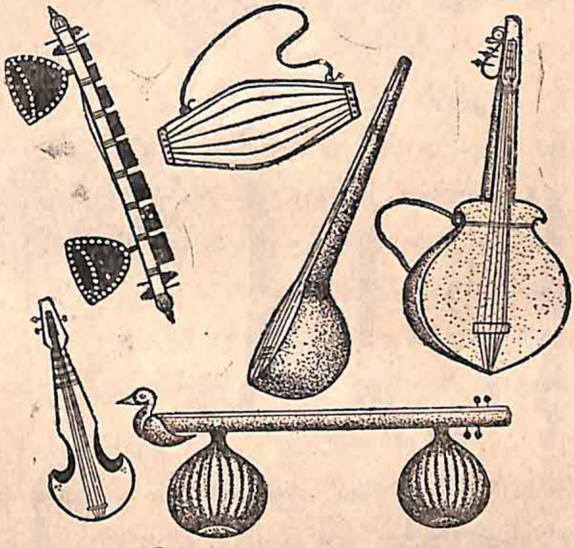


দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তরে মুঘল বাদশাহের বিচারসভায় ন্যায়বিচারের প্রতীক তুলাদণ্ড

এই সমন্বয়ী সংস্কৃতির উচ্ছ্বাস বাধা পাইল সংকীর্ণচেতা ঔরংজেবের কাছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ রুদ্ধ হইল, ধর্মাচরণে গোঁড়ামি দেখা দিল। তাহার অপূর্ব অবদান ভবিষ্যতের হাতে সমর্পণ করিয়া মুঘল সভ্যতা সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হইল।

বৈদেশিক সম্পর্ক : মুঘলদের আমলে পর্তুগীজরা অতলান্ত ও ভারত

সাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসে এবং ব্যবসায়ের জন্য বন্দর স্থাপন করে। তাহারা ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য আরবদের হাত হইতে কাড়িয়া একচেটিয়া করিয়া লয়। কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকিতে পারিল না। তাহারা ছিল একাধারে বণিক ও দস্যু। তাহাদের



মুঘল যুগের বাদ্যযন্ত্র

অত্যাচার ও চুরিবাটপাড়ির জন্য শাজাহান ও ঔরংজেব তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলেন। শেষে অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়া তাহারা বাণিজ্য ছাড়িয়া দিল। ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানি আসিয়া এখানে কুঠি স্থাপন করিল। ইহাদের সঙ্গে আসিলেন মিশনারি ও পর্যটক। ইয়োরোপীয় আগন্তুকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্যার টমাস রো। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ তাঁহাকে একটি বাণিজ্য-চুক্তি করিবার জন্য জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাণিজ্যের সুবিধা ও কোথাও কোথাও কুঠি স্থাপনের অধিকার লাভ করেন। তিনি তিন বছর দিল্লীতে থাকিয়া এদেশের অনেক বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।



মুঘল আমলের অস্ত্র

মুঘল আমলে কামান, বন্দুক ইত্যাদি আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। সেই সঙ্গে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, কুঠার, তীরধনু এরূপ বিবিধ হাতিয়ারও যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত।

মুঘল আমলে চীন ও ইয়োরোপের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চালান যাইত সুতার কাপড়, খাবার মশলা, নীল, আফিম ইত্যাদি। চীন হইতে আসিত প্রধানতঃ রেশম ও চীনামাটির বাসন। ইয়োরোপ পাঠাইত সোনা ও রূপা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে স্থলপথ প্রসারিত ছিল চীন ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত। কিন্তু সমুদ্রতীরের বন্দর হইতে জলপথেই পণ্য চলাচল হইত বেশী।

মুঘল আমলে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বহু ইয়োরোপীয় বণিক ও পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে রানফ্ ফিচ্ নামে জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্যার টমাস্ রো ব্যতীত যে সমস্ত ইয়োরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উইলিয়ম হকিন্স এবং ফ্রান্সিসকো-র নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বিবরণী হইতে জানা যায় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত মুঘল রাজগণের সদ্ভাব ছিল। স্যার টমাস রো চার বৎসর মুঘল দরবারে ছিলেন। শাজাহান ও ঔরংজেবের রাজত্বকালে টাভার্নিয়ে ও বার্ণিয়ে নামক ফরাসী পর্যটক এবং মানুচি নামক একজন ইতালীয় পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহাদের বিবরণী হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের মৌলিক দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত বৈদেশিক পর্যটক ও বণিকগণের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজদের কুঠি গড়িয়া উঠে। কিন্তু শাজাহানের রাজত্বকাল হইতে পর্তুগীজদের সহিত সম্পর্কের অবনতি হইতে থাকে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস মুঘলদের অধিকার হইতে কান্দাহার দখল করিয়া লন। ইহা লইয়া পারস্যরাজের সহিত শাজাহানের বিরোধ বাধে। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের

জন্য শাজাহান দ্বাদশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন কিন্তু স্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। শাজাহান স্বীয় পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি বাল্‌খ্‌ ও বাদাখ্‌সান পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ফলে মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সহিত মুঘলদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। ১৬৬১—১৬৬৭ সালের মধ্যে ঔরংজেব শুভেচ্ছা মূলক রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্কের উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সামাজিক ও আর্থিক জীবন : মুঘল আমলের অনেক বিবরণী হইতে দেশের আথিক ও সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। ইয়োরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনীতে এদেশের অনেক কথা আছে। ইংরাজ ক্যাপ্টেন হকিন্স ও টমাস রো, ফরাসী টার্ভানিয়ে ও বার্ণিয়ে এবং ইতালীয় মানুচি সপ্তদশ শতকের চিত্র আঁকিয়াছেন। কোম্পানির কুঠির দলিলপত্রেও অনেক খবর আছে। বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী, আবুল ফজ্‌ল-এর 'আইন-ই-আকবরী' এবং ফারসীভাষায় লেখা সমকালীন ইতিহাস হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইহা ছাড়া আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রাদেশিক সাহিত্য। বাংলা ভাষায় মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' বাঙালীর সামাজিক ও আর্থিক জীবন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঐশ্বর্য ভোগ করিতেন সম্রাট্‌ ও আমীর ওমরাহরা। তাঁহারা প্রচুর বিলাস বাসনের মধ্যে দিন কাটাইতেন। তাঁহারা ছিলেন আরাম-প্রিয় ও পানাসক্ত। শেঠ ও বণিকরা সাদাসিধা জীবনযাপন করিত। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ছিল বর্ধিষ্ণু ও বিলাসী। সাধারণ লোক ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ধনবৈষম্য বিদেশী পর্যটকরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশ্য এরূপ বৈষম্য অন্যান্য

দেশেও দেখা যায়। ভারতবর্ষ ধনসমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই বৈষম্য বেশী করিয়া নজরে পড়িত। সাধারণ লোকের মোটামুটি খাওয়া-পরা জুটিত, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্গতির সীমা থাকিত না।

নিত্য ব্যবহারের জিনিস ছিল খুব সস্তা—যেমন চাল, তরিতরকারি, মসলা, মাংস, দুধ, গরু, ছাগল ইত্যাদি। খাবার জিনিস প্রচুর মিলিত। কিন্তু জিনিসপত্র সস্তা হইলেও লোকের আয় ছিল সে অনুপাতে আরও কম, তাই অভাবের মধ্যে দিন কাটিত। তবে সেকালে চাহিদা ছিল কম, জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সরল, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে একালের মত অভাববোধ ও অসন্তোষ এত জাগিয়া ওঠে নাই।

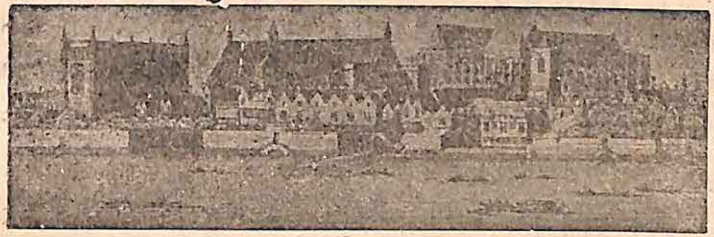
কালক্রম

	২৬	পানিপথের যুদ্ধ
	৩০	হুমায়ুন
১৫৫০	৩৯	শের শাহ
	৫৫	হুমায়ুনের সিংহাসন পুনরুদ্ধার
	৫৬	আকবর
	৮২	দীন-ই-ইলাহী
১৬০০	০৫	জাহাঙ্গীর
	০৯-১১	ক্যাপ্টেন হকিন্স
	১৩-১৫	টমাস রো
	২৮	শাজাহান
১৬৫০		টাভানিয়ে, বাণিয়ে
	৫৮	ঔরংজেব
		মানুচি
	৭২	আফ্রিদি বিদ্রোহ
	৭৭	শিবাজীর কর্ণাটক জয়
১৭০০	০৭	ঔরংজেবের মৃত্যু
	৩৯	নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ
	৪৭	আহমদশাহ্ আবদালীর আক্রমণ

ষোড়শ শতকে টিউডর বংশের রাজাদের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের জীবনে নানাদিক দিয়া পরিবর্তনের জোয়ার আসিয়াছিল। বেকন, শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতি সাহিত্যে নবজাগরণ আনিলেন। অষ্টম হেনরী পোপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, আর রাজ-সাহায্য লাভ করিয়া বণিকরা ও নাবিকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য বিস্তারে বাহির হইল। প্রাচ্যদেশের পণ্য আনিয়া ইয়োরোপে বেচিয়া একদল ইংরাজ বণিক ধনী হইয়া উঠিল। তাহারা সমাজেও প্রতিপত্তি লাভ করিল এবং পার্লামেণ্টের মারফত সরকারী ক্ষমতা অর্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এতদিন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল জমিদার, রাজা ও অভিজাতদের হাতে। এবার অভিজাত জমিদার ও মধ্যবিত্ত বণিক, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা শুরু হইল। এই প্রতিযোগিতার পরিণামই সপ্তদশ শতকের বিপ্লব।

টিউডর রাজত্ব ঃ টিউডর রাজারা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে বাধা দিতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের সময়ে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে ক্ষমতার বিবাদ শুরু হয় নাই। রাণী এলিজাবেথ পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬০৩ সালে যখন প্রাণত্যাগ করিলেন তখন ইংলণ্ড সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, বাণিজ্য ও নৌবলে স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে। সেখানে ফ্রান্স ও জার্মানীর মত ধর্ম লইয়া মারামারি নাই। অষ্টম হেনরীর প্রবর্তিত নরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের আশ্রয়ে ইংলণ্ডবাসী শান্তিতে বাস করিতেছে।

স্টুয়ার্ট বংশ : এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই। তাঁহার পর টিউডর রাজত্বের অবসান হইল। স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম জেমস্ রাজা হইলেন। মা'র দিক দিয়া টিউডর বংশের সঙ্গে যোগ থাকিলেও তাঁহার পিতৃপুরুষ ছিলেন বিদেশী। তাই স্টুয়ার্ট রাজাদিগকে ইংরাজরা বিদেশী বলিয়া গণ্য করিত। ইংলণ্ডের যুগপরিবর্তনের মুখপাত্র ছিল পার্লামেণ্ট বা রাষ্ট্রসভা। এখানে শহর ও জেলার প্রতিনিধিরা আসিয়া



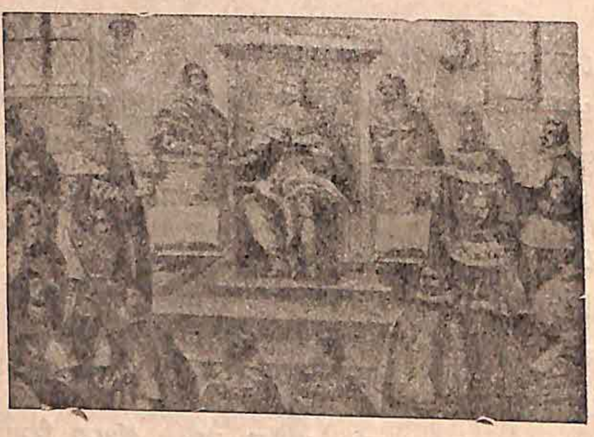
পার্লামেণ্ট ভবন

রাজাকে দেশ শাসনে সাহায্য করিত। এতদিন রাজায় ও পার্লামেণ্টে বিবাদ ছিল না, কারণ রাজা জাতির প্রতিভূ ছিলেন এবং পার্লামেণ্টের মতামত মান্য করিতেন। স্টুয়ার্ট রাজারা একে বিদেশী তার উপর তাঁদের ছিল জিদ ও হঠকারিতা। তাঁহাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বনিল না।

রাজা ও পার্লামেণ্ট : রাজা প্রথম জেম্স্ ও প্রথম চার্লস্ ছিলেন রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া প্রাচীনপন্থী। তাঁহারা মনে করিতেন যে রাজা ঈশ্বরদত্ত অধিকার-বলে রাজ্য শাসন করেন। কাজেই তাঁহার উপর কাহারও কথা খাটিবে না। এদিকে রিনাইসেন্স ও রিফর্মেশন আন্দোলন লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়াছে। তাহাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পার্লামেণ্ট বলিল ঈশ্বরদত্ত

অধিকার বাজে কথা—রাজাকে পার্লামেণ্টের মত লইয়া দেশ শাসন করিতে হইবে। রাজা মানিলেন না। পার্লামেণ্টের অধিকার ছিল যে তাহার সম্মতি না পাইলে রাজা কোন খাজনা তুলিতে পারিবেন না। রাজা এ অধিকার অমান্য করিয়া ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করিলেন। দেশের নিয়ম ছিল যে বিধিসঙ্গতভাবে আদালতে বিচার হইলে তবে অপরাধীর শাস্তি হইতে পারিবে। রাজা কাহারও উপর বিরূপ হইলে আদালতে বিচার না করিয়াই সাজা দিতেন। ইংলণ্ডের জাতীয় ধর্মের প্রতি রাজা প্রসন্ন ছিলেন না, বরং তাহার মমতা ছিল ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি। ইহা লইয়াও তিক্ততার সৃষ্টি হইল। রাজা চাহিতেন পার্লামেণ্টকে এড়াইয়া শাসন চালাইতে। পার্লামেণ্টও সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে বাধা দিত।

প্রথম চার্লসঃ এই ঝগড়া চাল্‌স্-এর আমলে গুরুতর আকার ধারণ করিল। তিনি স্পেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়া ব্যয়-



রাজসভায় প্রথম চার্লস্

বরাদ্দের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে হাত পাতিলেন। পার্লামেণ্ট টাকা দিতে গররাজি হইল। তখন তিনি বে-আইনী ভাবে খাজনা আদায়

করিতে লাগিলেন। ১৬২৮ সালে পার্লামেণ্ট নিজ অধিকার দাবি করিয়া এক দরখাস্ত পেশ করিল,—ইহাকে বলে 'পিটিশন অফ রাইটস্'। পাঁচশ' বছর ধরিয়া যে সব সনদ ও প্রথার বলে রাজার ক্ষমতা সীমায়িত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিল যে বে-আইনীভাবে খাজনা তুলিবার, কাহাকেও জেলে পুরিবার কিংবা প্রজাদের বাড়ীতে সৈন্য বসাইবার ক্ষমতা রাজার নাই। চার্লস্ পার্লামেণ্টকে বিদায় দিয়া যথেচ্ছভাবে শাসন চালাইতে লাগিলেন, যেন ইংলণ্ড তাঁহার জমিদারী। শেষে যুদ্ধের খরচ কুলাইতে না পারিয়া এগার বছর পরে আবার পার্লামেণ্টের সভা ডাকিলেন। অনেক দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন চলিয়াছিল বলিয়া ইহাকে বলে 'লঙ পার্লামেণ্ট'।

পার্লামেণ্ট প্রথমেই রাজার বিরুদ্ধে কয়েক দফা নালিশ পেশ করিল। আইন পাশ করিল যে রাজা ডাকুন বা না ডাকুন, তিন বছরে অন্ততঃ একবার করিয়া পার্লামেণ্টের সভা বসিবে। যে সব প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টকে বাদ দিয়া দেশ শাসন করিতে রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিচার বসিল। কয়েকজনের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইয়া গেল। চার্লস্ পার্লামেণ্টকে সায়েস্তা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পার্লামেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ১৬৪২ সালে রাজভক্ত ও দেশভক্ত সেনার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। রাজার পক্ষে যোগ দিল অভিজাত ও উচ্চপদস্থ যাজকের দল—পার্লামেণ্টের পক্ষে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ নাগরিক।

পার্লামেণ্ট-বাহিনীর নায়ক ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। তিনি পার্লামেণ্টের সমর্থনে ইংলণ্ডের ধর্মচেতনা জাগাইয়া তুলিলেন। ইংলণ্ডের চার্চের প্রতি চার্লস্-এর প্রীতি ছিল না। সেই সুযোগে বিশুদ্ধ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের জিগির তুলিয়া এক দল সৃষ্টি হইল—

ইহাদিগকে বলিত 'পিউরিটান'। ক্রমওয়েলের সুদক্ষ পরিচালনায় পিউরিটান সেনা রাজকীয় সেনাকে পরাস্ত করিল। চার্লস্ বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায়ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে ছাড়িলেন না। তখন পার্লামেন্ট তাঁহাকে 'অত্যাচারী, বিশ্বাস-ঘাতক, হত্যাকারী ও দেশদ্রোহী' বলিয়া অভিযুক্ত করিল। ১৬৪৯ সালে পার্লামেন্টের বিচারে রাজপ্রাসাদের বাহিরে এক বধ্যভূমিতে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলা হইল। চার্লস্ শান্তভাবে মৃত্যু বরণ করিলেন।

প্রজাতন্ত্র ও ক্রমওয়েল : ইহার পর দশ বছর ধরিয়া ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্রের শাসন চলিল। এই নয়া বিধানের মেরুদণ্ড ছিল পিউরিটানরা। জাতির সর্বময় নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ক্রমওয়েল। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিলেন, হল্যাণ্ড এবং স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য ও নৌবল সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধ পিউরিটান ধর্মের আবেদনেও অনেকে ক্রমওয়েলকে সমর্থন করিলেন।

ক্রমওয়েল ছিলেন যেমন ধর্মপরায়ণ দেশপ্রাণ বিপ্লবনায়ক তেমনি আবার সুদক্ষ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁহার শাসন ইংরাজ জাতির পক্ষে ছিল বহু দিক দিয়া কল্যাণকর ও গৌরবের। কিন্তু প্রজাতন্ত্র ছিল নামে মাত্র। ক্রমওয়েল প্রথম চার্লস্-এর মতই নিজের খুশিমত রাজকার্য চালাইতেন। তাঁহার একনায়কত্ব রাজার পক্ষ কিংবা পার্লামেন্টের পক্ষ কেহই সমর্থন করিত না। রাজহত্যা এবং রাজাকে বাদ দিয়া শাসন চালনাও অনেকের মনঃপূত হয় নাই। স্টুয়ার্ট রাজারা যদি ঈশ্বরদত্ত অধিকার ছাড়িয়া পার্লামেন্টের প্রাধান্য মানিয়া লন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি রহিল না।

রাজতন্ত্রের পুনরাবর্তন : সুতরাং ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইলে পর স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৬৬০ সালে প্রথম চার্লস্-এর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে ঝামেলায় না গিয়া শান্তিপূর্ণভাবে শাসন চালাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাই দ্বিতীয় জেম্‌স্-এর আমলে আবার পার্লামেন্টের সঙ্গে গোলমাল বাধিল। তিনি ছিলেন প্রথম চার্লস্-এর মত জেদী ও ক্ষমতালোভী, তার উপর আবার গোঁড়া ক্যাথলিক। সকলের আশঙ্কা হইল আবার বুঝি ইংলণ্ডে রাজার খামখেয়ালী শাসন ও ক্যাথলিক ধর্ম ফিরিয়া আসিবে।



ক্রমওয়েল

রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে আবার বিবাদ শুরু হইল। জেম্‌স্ ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। ১৬৮৮ সালে পার্লামেন্ট জেম্‌স্-এর কন্যা মেরী এবং তাঁহার স্বামী হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি তৃতীয় উইলিয়মকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসাইল। ইঁহারা দুজনেই ছিলেন গণতন্ত্রবাদী ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট। তাঁহাদের আগমনে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম কায়েম হইল।

পার্লামেণ্টের প্রাধান্য : এই মহান সাফল্য বিনা রক্তপাতে অর্জিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে বলা হয় 'গৌরবময় বিপ্লব'। প্রজাদের যে সমস্ত অধিকার লইয়া এতদিন বিবাদ চলিতেছিল সেগুলি স্বীকার করিয়া একটি আইন রচিত হইল—তাহাকে বলে 'বিল অফ্ রাইট্স্'। মেরী ও উইলিয়ম এই আইন মানিয়া লইলেন। ইহাতে রাজার ক্ষমতা কমিয়া গেল এবং পার্লামেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই হইতে ইংলণ্ডে রাজা রাজত্ব করেন বটে কিন্তু শাসনভার আছে পার্লামেণ্টের হাতে।

কালক্রম

১৬০৩	স্টুয়ার্ট বংশ
	১ম জেম্স্
	১ম চার্লস্
১৬২৮	পিটিশন অফ্ রাইট্স্
১৬৪০	লঙ্ পার্লামেণ্ট আহ্বান
১৬৪২	যুদ্ধ
১৬৪৯	চার্লস্-এর প্রাণদণ্ড
	প্রজাতন্ত্র
১৬৬০	২য় চার্লস্
	২য় জেম্স্
১৬৮৮	মেরী ও উইলিয়ম

ঔরংজেবের রাজত্বকালে সুদূর দক্ষিণ ও প্রাচ্যের কিয়দংশ ভিন্ন সারা ভারতবর্ষ এক শাসনসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। কিন্তু চরম বিস্তৃতি ও গৌরবের সময়েই মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল। সর্বত্র দেখা দিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। উত্তর-পশ্চিমে শিখ জাতি, তাহাদের দক্ষিণে রাজপুত রাজন্যরা এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্য জুড়িয়া মারাঠা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রোহিলা নামে এক আফগান উপজাতি রোহিলাখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্য গঠন করিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সুবাদাররা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া বসিলেন। নামে মাত্র বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহারা দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এইরূপে বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বাদশাহ্‌রা ছিলেন দুর্বলমতি, ব্যক্তিত্বহীন—উজীরদের হাতের পুতুল। তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল দিল্লী ও তার চারপাশের অঞ্চলে। ইহার উপর আবার নাদির শাহ্‌ ও আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী আসিয়া দিল্লীর উপর দিয়া হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালাইলেন আর দিল্লীশ্বরের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া গেলেন।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ঃ মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় রাজা ও শাসকরা জনগণের হর্তাকর্তা হইয়া বসিলেন আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদে মাতিয়া উঠিলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তিকর অবস্থা ইয়োরোপীয় আগন্তুকদের পক্ষে হইল সুবর্ণ সুযোগ। পর্তুগীজ ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা বণিকসঙ্ঘ গড়িয়া ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে

বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। তাহারা এদেশের সরকারের নিকট হইতে সনদ লইয়া বন্দরে বন্দরে কুঠি করিয়া ব্যবসা শুরু করিয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা প্রতিযোগিতায় হারিয়া ভারতবর্ষ হইতে হটিয়া গেল—রহিল কেবল ইংরাজ ও ফরাসী। ঔরংজেবের আমলে ইংরাজরা মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় কুঠি করিল, কুঠির ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য কেল্লা ও কেল্লার সঙ্গে বসতিস্থাপন করিয়া শিকড় গাড়িল। ফরাসীদের ঘাটি হইল পণ্ডিচারী, চন্দননগর ও



ডুপ্লে

মাহে। দেশের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখিয়া ইংরাজ ও ফরাসী কোম্পানির মনে সাম্রাজ্যলাভের লালসা জন্মিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল।

পণ্ডিচারীর ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে প্রথম পথ দেখাইলেন। তিনি দেখিলেন এদেশের রাজাদের সেনাবল ইয়োরোপীয় ফৌজের কাছে

কিছুই নয়। অল্পসংখ্যক ভারতীয় সিপাহীকে ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তাহাদিগকে দিয়াই অনায়াসে বিপুল দেশীয় বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা যায়। ডুপ্লে স্থির করিলেন রাজাদের গৃহবিবাদে সুবিধামত পক্ষ লইয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সৈন্যের জোরে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য রচনা করিবেন। তখন কর্ণাটকে ও হায়দ্রাবাদে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়াছে। ডুপ্লে এক এক রাজ্যে



ক্লাইভ

এক এক প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসাইয়া দাক্ষিণাত্যে ফরাসী কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইংরাজ কোম্পানির টনক নড়িল। তাহারা ডুপ্লের চাল ধরিতে পারিয়া কর্ণাটকে প্রতিপক্ষের সমর্থনে যুদ্ধে নামিল। ডুপ্লের যোগ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ক্লাইভ। তাঁহার সাহস ও বুদ্ধির জোরে ইংরাজরা জয়লাভ করিল ও কর্ণাটকে নবাবের প্রভু হইয়া বসিল। এদিকে ফরাসী সরকার ডুপ্লের সাম্রাজ্যনীতি মঞ্জুর করিলেন না,—১৭৫৪ সালে তাঁহাকে ফ্রান্সে সরাইয়া আনিলেন। ইংরাজ কোম্পানির ধুরন্ধররা তাঁহার কুটনীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অপসারণে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথ সুগম হইল।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা: কর্ণাটকে ইংরাজরা অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভ করিলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল বাংলা দেশে।

১৬৯০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্ণক হুগলী নদীর মোহনার কাছে সূতানুটী নামক স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। কয়েক বছর পরে দিল্লীর বাদশাহ্ ও বাংলার সুবেদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি কোম্পানির পক্ষে সূতানুটী, কলিকাতা (কালিঘাট) ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারী পাইলেন এবং ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক কেল্লা নির্মাণ করিলেন। ইহা হইতেই বর্তমান কলিকাতা নগরীর জন্ম। অতঃপর কোম্পানির উপনিবেশ বাড়িতে লাগিল। ওদিকে বাংলা দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইল। দাক্ষিণাত্যে যখন ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে লড়াই চলিতেছে তখন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তাঁহার সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ বাধিল। সিরাজের মন্ত্রীরা ও সেনানায়ক মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে মিলিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র করিলেন। মাত্র তিন হাজার সৈন্য লইয়া ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে চলিলেন। ১৭৫৭ সালে ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে কোম্পানির ক্ষুদ্র বাহিনী বিপুল নবাবী সেনার সম্মুখীন হইল। সেনাপতি মোহনলাল ও মীরমদনের

সামনে ক্লাইভের সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এমন সময়ে মীরজাফরের পরামর্শে সিরাজ যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। এই সুযোগে ক্লাইভ নিরস্ত্র নবাবী সেনার উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিলেন। সিরাজ বন্দী হইয়া মীরজাফরের পুত্রের হাতে নিহত হইলেন। কোম্পানি মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইল, বিনিময়ে পাইল প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ পরগণার জমিদারী।



সিরাজউদ্দৌলা

মীরজাফরকে মসনদে বসাইয়া কার্যতঃ ক্লাইভ নবাবী চালাইতে লাগিলেন। ক্লাইভ দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পর বাংলার রাজকোষ লইয়া কোম্পানির ধুরন্ধরদের ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ হইল। নবাবকে চাপ দিয়া টাকা আদায় হইল তাঁহাদের একমাত্র কাজ। যখন মীরজাফর আর টাকা যোগাইতে পারিয়া উঠিলেন না তখন তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে তাঁহারা মস্‌নদে বসাইলেন। মীরকাশিম ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও স্বাধীনচেতা। তিনি কোম্পানির কর্মচারী ও ফড়িয়াদের শোষণ বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। আবার কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। মীরকাশিম পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হইলেন। ১৭৬৪ সালে বক্‌সারে উভয়ের মিলিত সেনা ইংরাজের হাতে পরাস্ত হইল। কোম্পানি আবার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইল।

পলাশীর ও বক্সারের জয় বাংলায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিল। পরের বছর ক্লাইভ ফিরিয়া আসিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে কোম্পানির পক্ষে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিলেন। চুক্তি হইল কোম্পানি বাদশাহ্‌কে বছরে চব্বিশ লক্ষ টাকা নজর দিবে, বিনিময়ে এই তিন প্রদেশের খাজনা আদায় ও



দিল্লীশ্বর শাহ্‌ আলম ক্লাইভকে দেওয়ানির
সনদ দিতেছেন

ভোগ করিবে। ক্লাইভ নবাবকে একটা বার্ষিক পেনশন বরাদ্দ করিয়া সরাইয়া রাখিলেন। ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর বাংলার বুকের উপর বেপরোয়া অত্যাচার ও শাসন চলিল। বাংলা সর্বস্বান্ত হইয়া দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িল। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী না খাইয়া মরিল। এই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষকে বলে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।

এবার ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেস্টিংসকে কোম্পানির রাজ্যের বড়লাট করিয়া পাঠাইলেন। বাংলার নবাবী প্রহসন শেষ হইল। কোম্পানির রাজত্ব আরম্ভ হইল।

মহীশূর : বাংলার মত সহজে অন্য জায়গায় কোম্পানি সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই।



ওয়ারেন হেস্টিংস

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন পূর্বাঞ্চলের দেওয়ানি হস্তগত করিল, সেই সময় মহীশূরের হিন্দু রাজাকে সরাইয়া হায়দর আলি সিংহাসনে বসেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার ছিল সুদৃঢ় সঙ্কল্প, অদম্য সাহস ও ক্ষুরধার বুদ্ধি। উত্তর ও পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে গিয়া হায়দ্রাবাদের নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহার দ্বন্দ্ব বাধিল। কোম্পানির মাদ্রাজ শাখা হায়দরের বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠার দলে যোগ দিল। হায়দরের হাতে পরাস্ত হইয়া মাদ্রাজ সরকার সন্ধি করিল, কিন্তু কিছুকাল পরে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করিলে পর সন্ধির সর্ত ভাঙিতে দ্বিধা করিল না। ইহার উপর আবার তাহারা মহীশূরের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করিয়া বসিল। হায়দর মাদ্রাজের উপর চড়াও হইয়া কোম্পানিকে



হায়দর আলি

বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কোম্পানি আবার সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

টিপু বেশীদিন শান্তিরক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। তিনি কোম্পানির মিত্র রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিলেন। আবার যুদ্ধ বাধিল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধিচুক্তিতে টিপুকে অনেক টাকা খেসারত দিতে এবং রাজ্যের অনেক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। কয়েক বছর পরে বড়লাট ওয়েলেস্‌লী তাঁহাকে কোম্পানির বশীভূত করিয়া এক মৈত্রীচুক্তি করিতে চাহিলেন। টিপু ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া ফরাসীদের সহযোগিতায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আবার ইংরাজ সেনা নিজাম ও মারাঠার সঙ্গে মিলিয়া মহীশূর আক্রমণ করিল। টিপু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন (১৭৯৯)। কোম্পানি, নিজাম ও পেশোয়া মহীশূরের প্রায় অর্ধাংশ ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। মধ্যভাগে কোম্পানির ছত্রছায়ায় হায়দরের পূর্ববর্তী হিন্দু রাজবংশ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিছুকাল পরে ইংরাজ কর্ণাটক অধিকার করিয়া লইল।


টিপু সুলতান

কোম্পানির রাজ্য প্রসারণের সময়ে ভারতীয় রাজন্যদের ভিতর যে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, মিথ্যাচার ও দাসত্বভাব

দেখা যায় হায়দর ও টিপু ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তাঁহারা কখনো ইংরাজের কাছে মাথা নোয়ান নাই, নিজাম বা ইংরাজের মত চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। স্বাধীনতার জন্য সারা জীবন যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের ছিল ইংরাজের অভিসন্ধি বুঝিবার মত রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস। ইংরাজের চাতুরী ও দেশীয় রাজাদের ঈর্ষার নিকট মহীশূরের স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ-শক্তি নিষ্কণ্টক হইল।

মারাঠা ঃ মহীশূরের পরাজয়ের সমসময়ে কোম্পানির অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল।

মারাঠা জাতির আঘাতে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছিল তখন তাহাদিগকে চালনা করিতেন পেশোয়া বা রাজমন্ত্রী। পরে পেশোয়া রাজা হইয়া বসিলেন। এক এক করিয়া উত্তর ভারতের অঞ্চলগুলি পদানত করিয়া পেশোয়া প্রথম বাজিরাও প্রায় অর্ধেক ভারতের অধীশ্বর হইলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য তিনি ইহা তাঁহার সেনাপতিদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইলেন। এইরূপে মারাঠা সাম্রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হইল। ইহার একভাগ লইয়া ও সর্বাধিনায়ক হইয়া রহিলেন পেশোয়া।

এমন সময়ে আফগানিস্তান ও পঞ্জাবের পথ দিয়া উল্কার মত উদয় হইলেন আহ্মদ শাহ্ আব্দালী। রোহিলারা ও অযোধ্যার নবাব তাঁহার পক্ষ লইলেন। আফগান ও মারাঠাদের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা হইল ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে। এই ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে তৃতীয়বার ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইল। মারাঠারা অসীম বীরত্ব দেখাইয়াও আহ্মদ শাহের সমর-

কৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইল। পেশোয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বিপর্যয়ের পর মারাঠাদের জাতীয় সংহতি শিথিল হইয়া গেল আর কোম্পানির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল।

তরুণ পেশোয়া মাধব রাও আশায় বুক বাঁধিয়া আবার শক্তি সমাবেশ করিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যখন মারাঠা জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছেন এমন সময়ে ১৭৭২ সালে তাঁহার মৃত্যু হইল। পানিপথের পর এই দ্বিতীয় দুর্যোগে মারাঠা জাতি নিজেদের ভালমন্দ বুঝিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইল। মাধব রাও-এর ভাই নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তাঁহার কাকা রঘুনাথ পেশোয়া হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একদল নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাদের নেতা হইলেন নানা ফড়্‌নবীশ।



নানা ফড়্‌নবীশ

দেশীয় রাজাদের চিরা-চরিত মূর্খতার বশবর্তী হইয়া বিরোধী দলকে দমন করিবার জন্য রঘুনাথ ইংরাজের শরণ লইলেন। বোম্বাই সরকারের সহিত তাঁহার সুরাটে এক চুক্তি হইল। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজ মারাঠার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল। চার বছর ধরিয়া উভয় পক্ষের অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের পর ১৭৮২ সালে সল্‌বইতে সন্ধি হইল। উত্তর ভারতে মহাদাজী সিন্ধিয়ার ও মহারাষ্ট্রে নানা ফড়্‌নবীশের নেতৃত্বে মারাঠাজাতি আবার

শক্তি সঞ্চয় করিল। নানা ফড়্নবীশ মারাঠা রাজাদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য ফিরাইয়া আনিলেন। টিপুর পতনের পর মহীশূরের কিয়দংশ তিনি পেশোয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাস্ত হইলেন, হায়দ্রাবাদ পেশোয়ার সামন্তরাজ্যে পরিণত হইল।

এমন সময়ে বজ্রপাতের মত আবার এক আকস্মিক দুর্যোগ ঘটিল। তরুণ পেশোয়া নানার অভিভাবকত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পেশোয়ার আসন লইয়া ষড়যন্ত্র ও কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। নানা প্রতিপত্তি হারাইয়া ১৮০০ সালে প্রাণত্যাগ করিলেন। আত্মকলহের মধ্যে মারাঠাদের সকল সম্ভাবনার অবসান হইল।

পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল বুনিতে বুনিতে মারাঠা রাজা ও নায়কগণ এতই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন যে ইংরাজদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না। সুযোগ বুঝিয়া ওয়েলেস্লীর সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বাহিনী তাঁহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিল (১৮০৩)। রাজ্যের বহুল অংশ হারাইয়া তাঁহারা করদরাজে পর্যবসিত হইলেন। চৌদ্দ বছর পরে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়া, ভোঁসলা ও হোলকারের অবশিষ্ট শক্তি বিলুপ্ত হইল (১৮১৭)। মুঘল ও মারাঠার শূন্য আসনে ইংরাজ কোম্পানির অধিষ্ঠান হইল।

করদ-মৈত্রীঃ ওয়েলেস্লী ছিলেন ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী। দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিনাযুদ্ধে কোম্পানির আওতায় আনিবার জন্য তিনি তাহাদের সম্মুখে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইহাকে বলে 'সাব্সিডিয়ারী এলায়েন্স' বা 'করদ-মৈত্রীর' প্রস্তাব। ইহার সারমর্ম হইল যে রাজা বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সরকারের হাতে

ছাড়িয়া দিবেন। ইংরাজের অনুমতি না লইয়া তিনি কোন পররাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্ধি বা আলোচনা করিতে পারিবেন না। সেনাবিভাগ ব্রিটিশ অধিকারে থাকিবে এবং ইহার ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজ্যের কিছু অংশ ব্রিটিশ সরকারকে ছাড়িয়া দিতে হইবে অথবা বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে হইবে। বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার রাজাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। এই প্রকার মৈত্রী দাসত্ব বই আর কিছু নয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব এই ফাঁদে পা দিলেন। কয়েক বছর পরে অযোধ্যার নামমাত্র স্বাধীনতাও ব্রিটিশ সরকার হরণ করিয়া লইলেন। হতবীর্য পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা রাজাদের ভাগ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিল। মহীশূরের হিন্দু রাজাকেও ওয়েলেস্‌লী করদ-মৈত্রীর ফাঁদে জড়াইলেন। একমাত্র টিপু সুলতান এই দাসত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

শিখ: মারাঠার পর বাকি রইল শিখ। ঔরংজেবের আমলে শিখরা ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় হইতে স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু তাহারা ছোট ছোট মিস্‌ল্-এ বা রাজ্যগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং পরস্পর বিবাদ করিত। ১৭৯৮ সালে কাবুলের রাজা পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়া রণজিৎ সিংহ নামে এক শিখ সর্দারকে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। রণজিৎ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মিস্‌ল্‌গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন, ইয়োরোপের শিক্ষক রাখিয়া সেনা-বাহিনীকে পাশ্চাত্ত্য কায়দায় যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। এক সন্ধি দ্বারা শতদ্রু নদী শিখ ও ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা ধার্য হইল। এইরূপে পূর্বপ্রান্ত সুরক্ষিত করিয়া রণজিৎ অন্য দিকে মন দিলেন। উত্তরে কাশ্মীর ও কাংড়া, পশ্চিমে এটক্ ও পেশোয়ার এবং দক্ষিণে মুলতান লইয়া সমস্ত পঞ্জাব জুড়িয়া শিখরাজ্য রচিত হইল। পশ্চিম

সীমান্তে রুশ আক্রমণের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁহার সঙ্গে আবার শান্তিচুক্তি করিলেন। এইরূপে এক সুদৃঢ় সুবিস্তৃত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন।

'পঞ্জাব-কেশরী' রণজিৎ ছিলেন জাতিস্রষ্টা ও রাষ্ট্রনায়ক। সমকালীন নীচতা ও নিষ্ঠুরতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া তিনি অপরাজেয় খাল্‌সাবাহিনী ও একতাবদ্ধ শিখরাজ্য গঠন করেন। তিনি ছিলেন সরল, ধার্মিক, কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ভারতের মানচিত্রে লাল-চিহ্নিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেখিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন 'সব লাল হো যায়েগা'! এই জন্যই তিনি ইংরাজের সঙ্গে অনাবশ্যক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন নাই।



রণজিৎ সিংহ

তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শিখ দরবার দুর্দান্ত খালসা সেনাকে বশে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা শতদ্রু পার হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিল। যথেষ্ট বিক্রম ও নৈপুণ্য দেখাইয়াও তাহারা পরাজিত হইল। ১৮৪৬ সালে লাহোরের সন্ধিতে শিখরা কাশ্মীর ও বিপাশা নদীর পূর্বাঞ্চল ছাড়িয়া দিল। একজন ইংরাজ কর্মচারী পঞ্জাবে নাবালক রাজার অভিভাবক হইয়া বসিলেন। দুই বছরের মধ্যে তাঁহার শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া শিখরা বিদ্রোহ করিল। বড়লাট ডালহাউসী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এবারও অনেক ক্ষতি সহ্য



ইংরাজ-শিখ যুদ্ধ

করিয়া শেষে ইংরাজরা জয়লাভ করিল। ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

ইতঃপূর্বে আর একটি প্রদেশ ইংরাজরা দখল করে। সিন্ধুদেশ ছিল বেলুচি সর্দার বা আমীরদের হাতে। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি করেন, পরে সন্ধির সর্ত ভাঙিয়া তাঁহাদিগকে করদ-মিত্রে পরিণত করেন। ১৮৪৩ সালে এই চুক্তিকেও জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজরা সিন্ধুদেশ একেবারে অধিকার করিয়া লইল। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণভাগ পেগুও এমনি অন্যায়ভাবে ডালহাউসী ইংরাজ অধিকারে আনিয়াছিলেন (১৮৫২)।

বিদ্রোহঃ সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। একশ' বছরের মধ্যে ক্লাইভ হইতে ডালহাউসী পর্যন্ত ইংরাজ শাসকগণ ছলে ও বলে ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। বস্তুতঃ ইংরেজের হইয়া এই সাম্রাজ্য গড়িয়া দিয়াছে ভারতীয় রাজন্য ও সিপাহীরাই। রাজারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজের হাতে রাজ্য তুলিয়া দিয়াছেন আর সিপাহীরা ইংরাজের পরিচালনায় দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে।


ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশ
আফগানিস্তান
কাশ্মীর
তিব্বত
লাহোর
পাতিয়ালা
বেলুচিস্তান
দিল্লী
ভরতপুর
আজমীর
যোধপুর
গোয়ালিয়র
উদয়পুর
এলাহাবাদ
লক্ষ্ণৌ
নেপাল
সিকিম
ভুটান
কুচবিহার
পাটনা
কলিকাতা
ব্রহ্ম
ভুপাল
ইন্দোর
সুরাট
নাগপুর
বোম্বাই
পুনা
আরব সাগর
মসুলিপট্টম
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
মহীশূর
পণ্ডিচারি
(ফরাসী)
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
-----১৭৯৫
-----১৮০৫
-----১৮২৩
-----১৮৫৭
--করদ রাজ্য

ডালহাউসীর বেপরোয়া রাজ্য গ্রাসের ফলে রাজন্যদের চোখ ফুটিল। সিপাহীরাও দেখিল তাহারা সারাজীবন ইংরাজদের হইয়া দেশোয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে। অথচ ইংরাজ সৈন্যরা তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন ও সুবিধা পায়। ইহার উপর তাহাদের ধর্মবোধে ঘা লাগিল। শুয়োর ও গরুর চর্বিমাখানো বন্দুকের টোটা তাহাদিগকে দাঁতে কাটিতে হইত। হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্মের এই অপমান তাহাদের সহ্য হইল না।

বিক্ষুব্ধ রাজা ও সিপাহীদের সঙ্গে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া যোগ দিল। কোম্পানি বহু জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। তাহাদের ও হৃতরাজ্য রাজাদের বেকার পাইক-বরকন্দাজরা আসিয়া জুটিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিস্তার ও মিশনারীদের কার্যকলাপ দেখিয়া অনেক হিন্দুমুসলমানের মনে ভয় ঢুকিল বুঝি সকলকে জবরদস্তি খ্রীষ্টান করা হইবে। কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচারে ও বণিকদের শোষণে সাধারণ লোকও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সকল শ্রেণীর মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ সালে বহুদিনের সঞ্চিত এই বারুদের স্তূপ সশস্ত্র বিদ্রোহে জ্বলিয়া উঠিল। বারাকপুর, মীরাট ও লক্ষ্ণৌতে সিপাহীরা ইংরাজ নায়কদিগকে হত্যা করিয়া শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে দিল্লী, কানপুর, বেরিলী ও ঝাঁসি, সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। দিল্লীতে মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট্ ঘোষণা করা হইল। উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হইল। কানপুরে সংগ্রাম পরিচালনা করিলেন পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব। তাঁহার ডান ও বাঁ হাত ছিলেন তান্তিয়া তোপি ও আজিমুল্লা খাঁ। ঝাঁসির সংগ্রাম পরিচালনা করেন

রাজ্যহারা বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈ। বিশ বছর বয়সে এই তরুণী রাণী পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্যচালনা করেন এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁহার দেশপ্রেম ও বীর্যবত্তার স্মৃতি আজও রূপকথার মত দেশবাসীর মনে জাগিয়া অছে।

এইরূপে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ইংরাজদের ভাগ্যগুণে একদল রাজন্য ও সিপাহী তাহাদের সহায় হইল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও নেপালের মহারাজা সর্বপ্রকারে ইংরাজদের সাহায্য করিলেন। সুদক্ষ ইংরাজ নায়কের পরিচালনায় দুর্ধর্ষ শিখ ও গুর্খাসেনা আসিয়া একে একে দিল্লী ও অন্যান্য নগরী পুনরুদ্ধার করিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রস্তুতি ছিল না। বুদ্ধি ও সাহসের অভাব না থাকিলেও তাহারা এতবড় সংগ্রাম চালাইবার মত সার্বভৌম নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কাজেই এই বিদ্রোহ ভারতের অধিকাংশ স্থানে প্রসারিত হয় নাই।



তান্তিয়া তোপি

উভয় পক্ষে কল্পনাতীত নৃশংসতার মধ্যে এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইল। বাহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্বাসনে প্রাণ দিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তান্তিয়া তোপিকে ধরিয়া ইংরাজরা হত্যা করিল। নানাসাহেব নিরুদ্দেশ হইলেন। এক বছরের মধ্যে সর্বত্র ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই সঙ্গে ইংলণ্ডের সরকার এক আইনের বলে কোম্পানির হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় এই পরিবর্তন সূচিত হইল।

সিপাহী-বিদ্রোহ বলিয়া পরিচিত এই বিদ্রোহ বস্তুতঃ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইহার ব্যর্থতার ফলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন বহুদিনের মত পিছাইয়া গেল। এদিকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে কোম্পানির বণিকদের বেপরোয়া শোষণের অবসান হইল, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েম হইয়া বসিল।

কালক্রম

১৬৯০	কলিকাতার জন্ম
১৭৩৯	নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ
৪৪-৪৮	প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ
৪৭	আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ
৫০-৫৪	দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ
৫৭	পলাশীর যুদ্ধ
৬১	পাণিপথের যুদ্ধ
৬৪	বক্সারের যুদ্ধ
৬৭-৬৯	প্রথম মহীশূর যুদ্ধ
৭০	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
৭২	মাধব রাও পেশোয়ার মৃত্যু
৭৫-৮২	প্রথম মারাঠা যুদ্ধ
৮০-৮৪	দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ
১৭৯০-৯২	তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ
৯৯	চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ
৯৯	রণজিৎ সিংহ স্বাধীন পঞ্জাবের রাজা
১৮০০	নানা ফড়্নবীশের মৃত্যু
০৩-০৫	দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ
১৭-১৯	তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ
৩৯	রণজিৎ সিংহের মৃত্যু
৪৩	ইংরাজের সিন্ধু জয়
৪৫-৪৬	প্রথম শিখ যুদ্ধ
৪৮-৪৯	দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ
৫৩	ইংরাজের পেগু জয়
৫৭-৫৮	সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৫৮	ভারতশাসনের হস্তান্তর মহারাণীর ঘোষণা

সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের বিপ্লবের সময়ে একদল ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ অতলান্ত মহাসাগর পার হইয়া উত্তর আমেরিকার পূর্ব তীরে বসবাস করিতে যায়। তাহারা আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের তাড়াইয়া ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন করিল। এই বসতিগুলিকে তাহারা তেরটি উপনিবেশে ভাগ করিয়া লইল। জাতিতে ইংরাজ হইলেও ইহারা ইংলণ্ডের শাসন পছন্দ করিত না। তিন হাজার মাইল দূরে তাহাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ড—সেখানকার আইনকানুন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার চেয়ে এই নূতন দেশে ইচ্ছামত আইন রচনা করিয়া বসবাস করাই তাহারা ভাল মনে করিত। বস্তুতঃ আঠার শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই বহাল ছিল। উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডের অনুকরণে গণতান্ত্রিক শাসন ও আইনসভার প্রবর্তন করিল। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি গভর্ণর বা লাটসাহেব মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। কেবল বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট উপনিবেশের উপর খানিকটা কর্তৃত্ব রাখিয়াছিল। কিন্তু এখানেও উপনিবেশের বণিকরা পার্লামেণ্টের বিধিনিষেধ ও শুল্কব্যবস্থা এড়াইয়া চলিত এবং পার্লামেণ্টও তাহা লইয়া বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি করিত না।

কিন্তু ইহার পর ইংরাজ সরকারের সুর বদলাইল। অনেক বছর যাবৎ ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য লইয়া চলিতেছিল পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা। আমেরিকায় ইংরাজ

উপনিবেশের উত্তরে ছিল ফরাসী উপনিবেশ ক্যানাডা। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ধাক্কা এখানেও আসিয়া লাগিল। শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের জয় হইল। ভারত ও আমেরিকার ফরাসী উপনিবেশ আসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে। এই সাম্রাজ্যই হইয়া দাঁড়াইল এক অনর্থের মূল। ব্রিটিশ সরকার ভাবিলেন সাম্রাজ্য রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, এবং অর্থসংগ্রহের উপায় উপনিবেশগুলির উপর খাজনা ধার্য করা। এদিকে উপনিবেশবাসীরা ভাবিল যখন আর ফরাসীদের প্রতিযোগিতার ভয় নাই তখন আর ইংলণ্ডের হুকুম মানিবার অথবা তাহাকে খাজনা দিবার আবশ্যকতা কি?

ইংরাজ সরকারের শুল্কনীতি : ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলিতে বিদেশ হইতে আমদানি কতক কতক পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিল। স্পষ্টই বলা হইল যে শুল্ক বসাইবার উদ্দেশ্য ছিল নিয়ন্ত্রণ নয়, মাতৃভূমির জন্য তহবিল যোগানো। আসলে ইহার পিছনে ছিল ইংলণ্ডের বণিকদের স্বার্থ। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া নিজেদের হাতে রাখা। গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি হইল এই যে যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আইনসভা গঠিত কেবল তাহাদের উপরই আইন পাশ করা অথবা খাজনা ধরা চলিবে,—প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইবার অধিকার না থাকিলে খাজনা দিবার দায়িত্ব থাকিবে না। এই গণতন্ত্রের নীতি ইংলণ্ডের কাছেই শেখা। উপনিবেশবাসীরা শুল্ক দিতে আপত্তি করিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকাবাসীদের প্রতিনিধি নাই। তবে আমেরিকানরা ইংলণ্ডকে খাজনা দিবে কেন? তাহারা বাঁকিয়া বসিল, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের জুলুম বরদাস্ত করিতে রাজী হইল না।

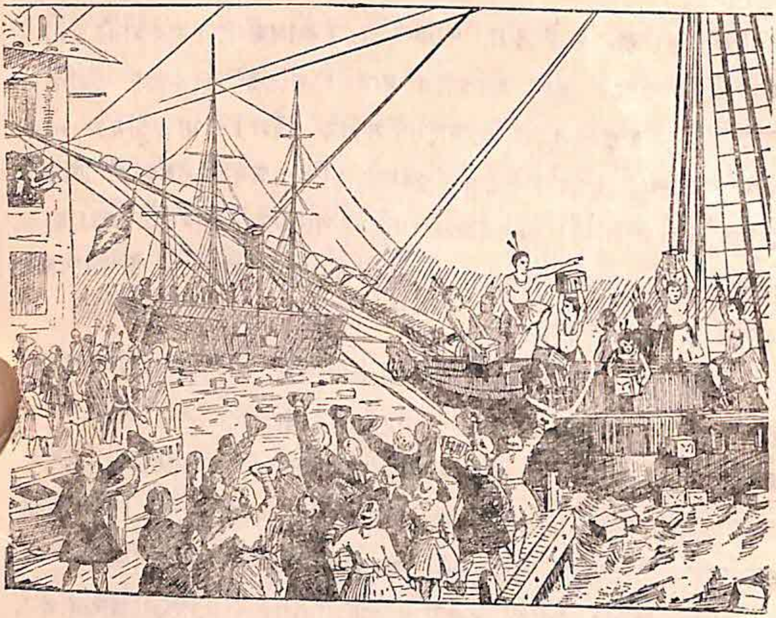
ইংলণ্ডও ছাড়িবার পাত্র নয়। পার্লামেণ্ট 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' নামে এক আইন জারি করিল। হুকুম হইল যে দলিলপত্র, বই, পুস্তিকা,

খবরের কাগজ, লাইসেন্স, লীজ ইত্যাদি কাগজপত্রে সরকারী টিকিট লাগাইতে হইবে এবং টিকিটের দাম ইংলণ্ডের সরকারী তহবিলে যাইবে। ইহাতে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। মাতৃভূমির সঙ্গে ব্যবসাপত্র বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ক্ষিপ্ত জনতা সরকারী টিকিট পোড়াইতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া পার্লামেণ্ট আইনটি প্রত্যাহার করিল এবং আমদানি শুল্কের হার কমাইয়া দিল। উপনিবেশ-বাসীরাও ঠাণ্ডা হইল।

কিন্তু পরের বছরই আবার ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি জিনিসের উপর শুল্ক বসাইলেন এবং আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি শুরু করিলেন। আবার আন্দোলন আরম্ভ হইল। জনসাধারণ বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিল, ব্যবসায়ীরা আমদানি বন্ধ করিল। আবার বেকায়দায় পড়িয়া পার্লামেণ্ট শুল্কগুলি প্রত্যাহার করিল, কিন্তু আমদানি চা-এর উপর শুল্ক রাখিয়া দিল। ইহাতে আন্দোলন কমিয়া গেল বটে কিন্তু উপনিবেশবাসীরা বিলাতী চা বয়কট করিয়া রাখিল। তাহারা গোপনে শুল্ক ফাঁকি দিয়া অন্য দেশ হইতে চা আনিতে লাগিল।

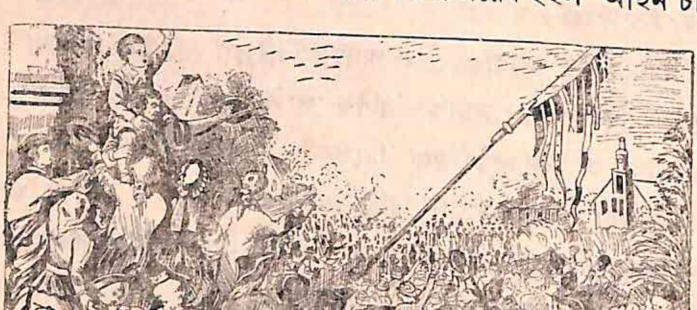
এমন সময়ে আবার এক অঘটন ঘটিল। ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক-গোষ্ঠীর হাতে চা আমদানির একচেটিয়া অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। কোম্পানি ভারতবর্ষ হইতে চা আনিয়া অল্প দামে বিক্রি করিতে লাগিল। ইহার ফলে উপনিবেশবাসীদের চা-ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল। একদিন বস্টন বন্দরে ক্ষিপ্ত জনতা কোম্পানির জাহাজে চড়াও হইয়া চা-এর বাক্সগুলি তুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল।

স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ ইহার পর ব্রিটিশ সরকারের আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। বস্টনবাসীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য কতকগুলি



ক্ষিপ্ত জনতা বস্টন বন্দরে চা-এর জাহাজে চড়াও হইয়া
চা-এর বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছে ;

আইন পাশ হইল। আর একদল ফৌজ মোতায়েন হইল আইন চালু



স্বাধীনতা ঘোষণার উৎসব

করিবার জন্য। ইহার পর আর কোন পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব

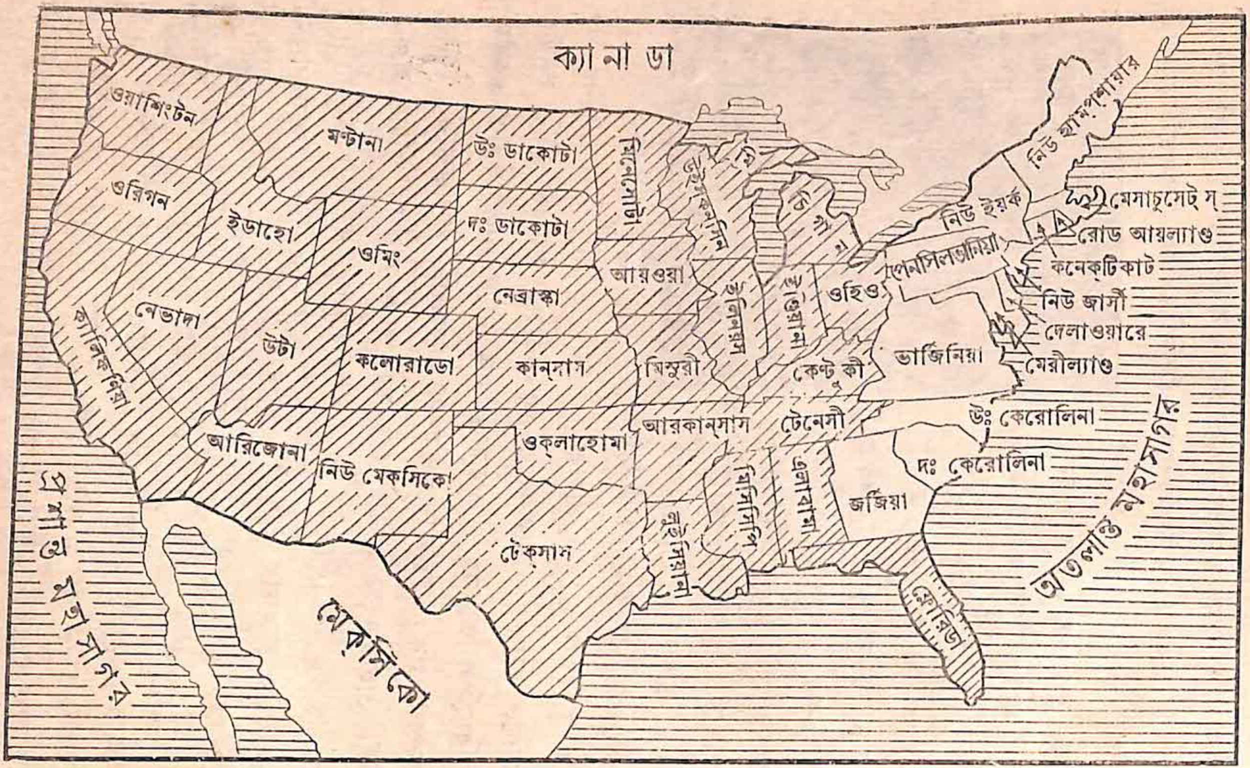
হইল না। জনতার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর এক ছোটখাটো লড়াই হইয়া গেল। তখন সমস্ত উপনিবেশের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

১৭৭৫ সাল হইতে সাত বছর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই বিদ্রোহীরা আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। সুযোগ বুঝিয়া ফরাসীরাও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িল না। তাহারা গোলাবারুদ ও স্বেচ্ছাবাহিনী পাঠাইয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। ইংরাজরাও যে সকলেই সরকারী নীতি সমর্থন করিয়াছিল তা নয়। এড্‌মাণ্ড বার্ক নামে পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থ গণতন্ত্রবাদী ও শক্তিশালী বক্তা। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বার বার সরকারকে সাবধান করিয়া বলেন যে উপনিবেশবাসীদের উপর জোরজুলুম করিবার বা খাজনা বসাইবার অধিকার তাহাদের নাই, উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়াই উচিত। কিন্তু সরকার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।



এড্‌মাণ্ড বার্ক

বিদ্রোহীরা আঠার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গড়িয়া তুলিয়া তাহার নেতৃত্ব দিল জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক সেনাপতিকে। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী ও সমরকুশল, তেমনি নির্লোভ ও চরিত্রবান। ছেলেবেলায় তিনি একবার তাঁহার পিতার বাগানের অতি প্রিয় একটি



আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র : পূর্ব উপকূলের মূল তেরটি উপনিবেশ শ্বেতচিহ্নিত। রেখাচিহ্নিত উপনিবেশগুলি পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চারাগাছ ভুলক্রমে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবেন জানিয়াও তিনি সত্য গোপন করেন নাই, নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। এমনি ছিল তাঁহার চরিত্র। তাঁহার সেনাবাহিনী তাঁহাকে দেবতার মত মান্য করিত। তাঁহার বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ও নৌবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। ইনিই পরে ভারতবর্ষে বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন এবং বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রঃ ১৭৮২ সালে ব্রিটিশবাহিনী পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। পরের বছর সন্ধি হইল এবং ইংলণ্ড তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। স্বাধীনতা পাইয়া উপনিবেশবাসীরা সাত বছর আগের স্মরণীয় দিনটিকে ভুলিল না।



জর্জ ওয়াশিংটন

এখনও বছর বছর ৪ঠা জুলাই তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে।

তেরটি উপনিবেশ মিলিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে এক রাষ্ট্র গঠন করিল। ১৭৮৮ সালে তাহাদের রাষ্ট্রের জন্য তাহারা এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজও এই সংবিধান বলবৎ আছে। এই সংবিধান অনুসারে প্রজারাই তাহাদের প্রতিনিধিদের মারফত দেশ শাসন করে।

ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেন প্রজাসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি মন্ত্রীদিগকে মনোনয়ন করেন এবং মন্ত্রীসভার সহায়তায় শাসন-কার্য পরিচালনা করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর যুক্তরাষ্ট্রের সব দিক দিয়া উন্নতি হইতে লাগিল। পশ্চিম দিকে বনজঙ্গলে ভরা প্রচুর অনাবাদী জমি পড়িয়াছিল। এসব জায়গা পরিষ্কার করিয়া আমেরিকানরা নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিল। ক্রমে তাহারা পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। একে একে গঠিত হইল পঁয়ত্রিশটি নূতন উপনিবেশ, তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইল। এক বিরাট ভূখণ্ডে ছিল অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদ উদ্ধার করিয়া যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং সামগ্রিক বলেও যুক্তরাষ্ট্র উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিয়াছে।

কালক্রম

১৭৬৩ প্যারির সন্ধি ও ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান
৬৪ আমদানি শুল্ক ও স্ট্যাম্প এ্যাক্ট
৬৬ স্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রত্যাহার
৬৭ নূতন শুল্ক
৭০ চা ব্যতীত অন্য শুল্ক প্রত্যাহার
৭৩ বস্টনে চা সমুদ্রে নিক্ষেপ
৭৫–৮২ স্বাধীনতার যুদ্ধ
১৭৮৮ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

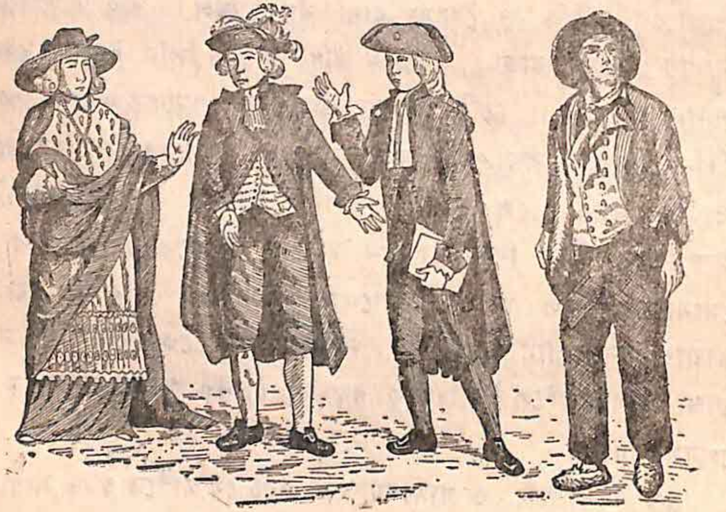
ইংলণ্ড ও আমেরিকার পরে ফ্রান্সেও এক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের আঘাতে শুধু রাজতন্ত্র নয়, সেই সঙ্গে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া গেল এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল।

পুরাতন ব্যবস্থা ঃ—অষ্টাদশ শতকের ফরাসী সমাজে নানা-প্রকারের দুর্নীতি ও বৈষম্য বাসা বাঁধিয়াছিল। রাষ্ট্র ও সমাজের মাথায় ছিলেন রাজা। দেবদত্ত অধিকার বলে তিনি ইচ্ছামত দেশ-শাসন করিতেন। তিনি ছিলেন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ তিনি রাজকার্য বড় একটা দেখিতেন না। প্রজাদের কল্যাণের দিকে তাঁহার নজর ছিল না। রাজধানী প্যারির বাহিরে ভার্সাইর ইন্দ্রপুরীতে তিনি বিলাস-ব্যসনে মাতিয়া থাকিতেন। জমিদার ও মোসাহেবের দল আসিয়া এখানে সভা জমাইত। বাবুগিরি করা ও রাজার মনযোগান ছাড়া এই নিষ্কর্মাদের আর কোন কাজ ছিল না। রাজা প্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে বড় বড় চাকরি অথবা মোটা মোটা পেন্‌সন দিতেন।

এই বিলাসিতা ও খামখেয়ালের খরচ যোগাইতে হইত সাধারণ প্রজাদের। রাজস্বব্যবস্থায় ছিল চরম দুর্নীতি ও বৈষম্য। যাজক ও অভিজাতরা ছিল ধনী। কিন্তু তাহারা খাজনা দিত কম। কাজেই গরীব লোকের উপর চাপ পড়িত বেশী। ন্যায্য খাজনা দেওয়া দূরে থাকুক এই দুই শ্রেণী গরিবদিগকে সাধ্যমত শোষণ করিত। চার্চের হইয়া যাজকরা জনকল্যাণ ও ধর্মকর্মের নামে কর লইত আর সে

টাকায় রাজা ও অভিজাতদের সাথে পাল্লা দিয়া বিলাসিতা ও অনাচার চালাইত। অভিজাতরা নিজ নিজ জমিদারীতে শুল্ক, সেলামী ও আবোয়াব আদায় করিয়া রাজার হালে বাস করিত। এই দুই লোভী স্বার্থপর শ্রেণী রাজার হইয়া দেশ শাসন করিত এবং সব রকমের সুখসুবিধা ভোগ করিত।

ইহাদের নীচে ছিল তৃতীয় শ্রেণী। বলিতে গেলে গোটা জাতিটাই ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। দেশশাসনে, সমাজে কিংবা কর-ব্যবস্থায় কোথাও তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। তাহাদের মধ্যে ছিল তিন প্রকারের লোক। প্রথম, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়



শ্রেণীগত পোশাকে যাজক, অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও চাষী

বা বুর্জোয়া—যেমন উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, সাহিত্যিক, শেঠ, বেনিয়া। বুর্জোয়াদের মধ্যে অনেকে বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতায় উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রচালনায় তাহাদের কোন হাত ছিল না। দ্বিতীয়, শহরের শিল্পী কারিগর। ইহাদের

ছিল বেকার সমস্যা। চাষীদের মধ্যে অনেকে বাস্তহারা ও নিঃস্ব হইয়া ইহাদের দলে জুটিয়াছিল। তৃতীয়, গ্রামের চাষী। ইহারা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বই'র চেয়েও বেশী। রাজা, যাজক ও জমিদার সকলের পাওনা মিটাইয়া বাকি থাকিত ফলনের পাঁচ-ভাগের একভাগ। তাহা দিয়াই সংসার চালাইতে হইত। ইহাতেও শান্তি ছিল না। ফসল নষ্ট করিলেও বনের পশুপাখী মারিবার উপায় নাই। শিকারের অধিকার জমিদারের একচেটিয়া। তাঁহার আমোদের জন্য পশুপাখী বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর অনেকে ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট। তাহাদের ধর্ম ছিল বে-আইনী, তাহাদিগকে গোপনে পূজা-উপাসনা করিতে হইত। এই সব অন্যায় ও অসাম্য রুশো, ভল্‌তেয়ার প্রভৃতি মনীষীরা লোকের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। আবেগময়ী ভাষা ও ধারালো যুক্তি দিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা প্রচার করিলেন। তাঁহাদের লেখায় জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইল আর সাধারণ লোক বুঝিতে লাগিল যে বিপ্লব ব্যতীত তাহাদের মুক্তি নাই।

এমন সময় ঘোষিত হইল আমেরিকার স্বাধীনতা। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের স্বেচ্ছাসেবকরা ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে আনিল স্বাধীনতা ও বিপ্লবের মন্ত্র।

রাষ্ট্রসভা ঃ রাজ্যের আয়ের চেয়ে ব্যয় ছিল অনেক বেশী। জাতীয় ঋণের বোঝা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছিল। আদায়ী খাজনার প্রায় অর্ধেক সুদে খরচ হইয়া যাইত। ঘাটতি পুরাইবার জন্য নূতন নূতন ঋণ সংগ্রহের ফিকির করিতে হইত। শেষে ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফ্রান্সের দেনার বোঝা বাড়িয়া রাজকার্য অচল করিয়া দিল। যে সরকার দেউলিয়া হইতে চলিয়াছে তাহাকে কে কর্জ

দিবে ? দু' একজন বিবেচক মন্ত্রী অপব্যয় কমাইয়া এবং ধনীদের উপর কর বসাইয়া অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থপর অভিজাতরা এমনি সোরগোল তুলিল যে রাজা একে একে তাহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন। রাজা ষোড়শ লুই-র না ছিল

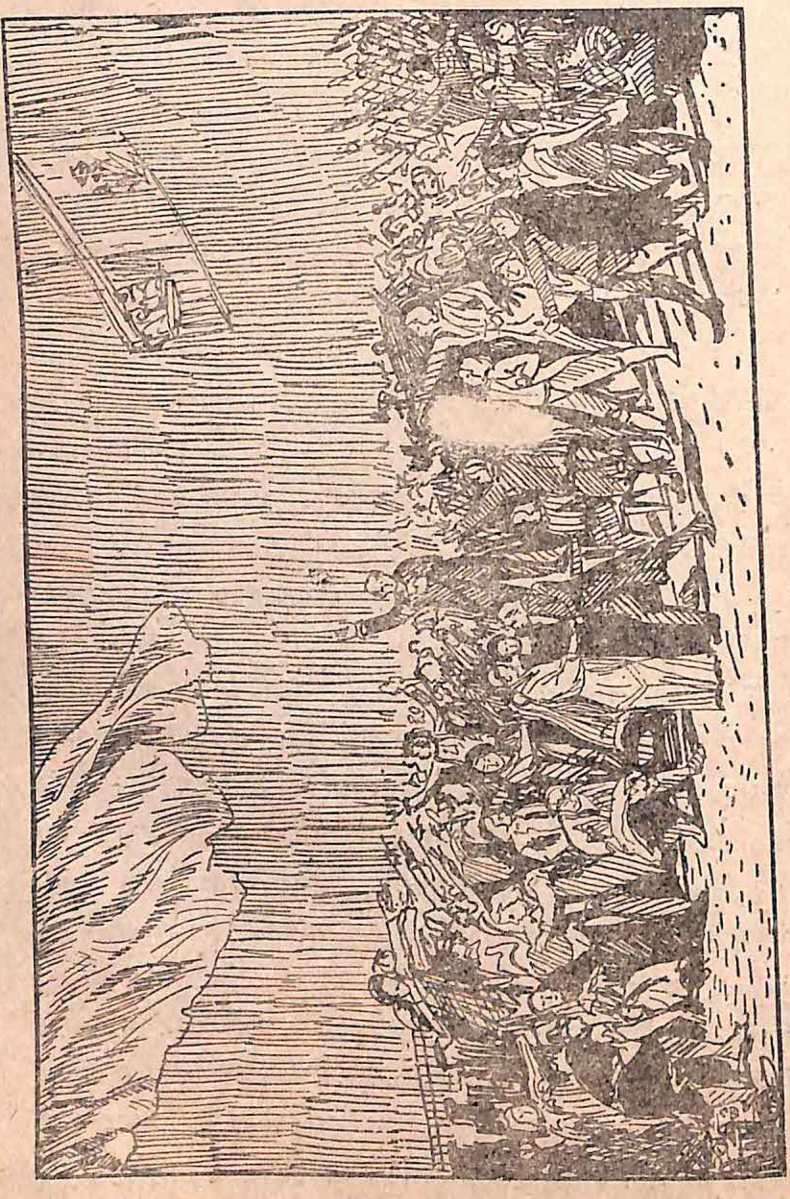


রাজা ষোড়শ লুই

নিজের কোন যোগ্যতা, না ছিল যোগ্য লোককে সমর্থন করিবার সাহস। শেষে কর্জ বন্ধ হইল, শাসন অচল হইল। নূতন কর ধার্য করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

কিন্তু কর তুলিবে কে? যে নীতিকে আশ্রয় করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিপ্লব ঘটিয়া গেল সে নীতি হইল এই যে কর ধার্য করিবার অধিকার রাজার নাই, আছে যাহারা কর দিবে তাহাদেরই। করদাতাদের প্রতিনিধিরা জাতীয় সভায় মিলিয়া দেশের আইনকানুন গড়িবে ও কর ধার্য করিবে। বহুকাল আগে ফ্রান্সে এরূপ একটি সভার রেওয়াজ ছিল, ইহাকে বলিত 'স্টেট্‌স্ জেনারেল'। তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ইহাতে আসিয়া মিলিত। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্‌কে যেমন টাকার জন্য পার্লামেণ্টের সভা ডাকিতে হইয়াছিল, ষোড়শ লুইকেও এখন ঠিক সেই কারণে স্টেট্‌স্ জেনারেলের সভা ডাকিতে হইল। চার্লস্ ডাকিয়াছিলেন এগার বছর পরে আর লুই ডাকিলেন একশ' পঁচাত্তর বছর পরে।

১৭৮৯ সালে ভার্সাইতে সভা বসিল। যাজক ও অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধিরা বলিল শ্রেণী হিসাবে পৃথকভাবে ভোট গণনা হইবে এবং অধিকসংখ্যক শ্রেণী যেরূপ মত করিবে সেরূপ কাজ হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বলিল সকলের একত্র ভোট গণনা হইবে এবং ভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ হইবে। প্রথম অবস্থায় কোন কিছু হওয়ার আশা নাই, কারণ অভিজাত ও যাজকশ্রেণী সব কিছুতে বাধা দিবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় দেশের সংস্কার করা সম্ভব, কারণ তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছিল সংখ্যায় বেশী। রাজা উচ্চ শ্রেণীর পক্ষ লইলেন, তৃতীয় শ্রেণীর মতলব দেখিয়া সভাগৃহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাহারা নিকটবর্তী একটি টেনিস খেলার হলে সমবেত হইয়া শপথ গ্রহণ করিল যে দেশের জন্য নয়া সংবিধান রচনা না করিয়া তাহারা সভা ত্যাগ করিবে না। রাজা আর দু' একবার গড়িমসি করিয়া শেষে মিলিত অধিবেশন ও যুক্ত ভোটের



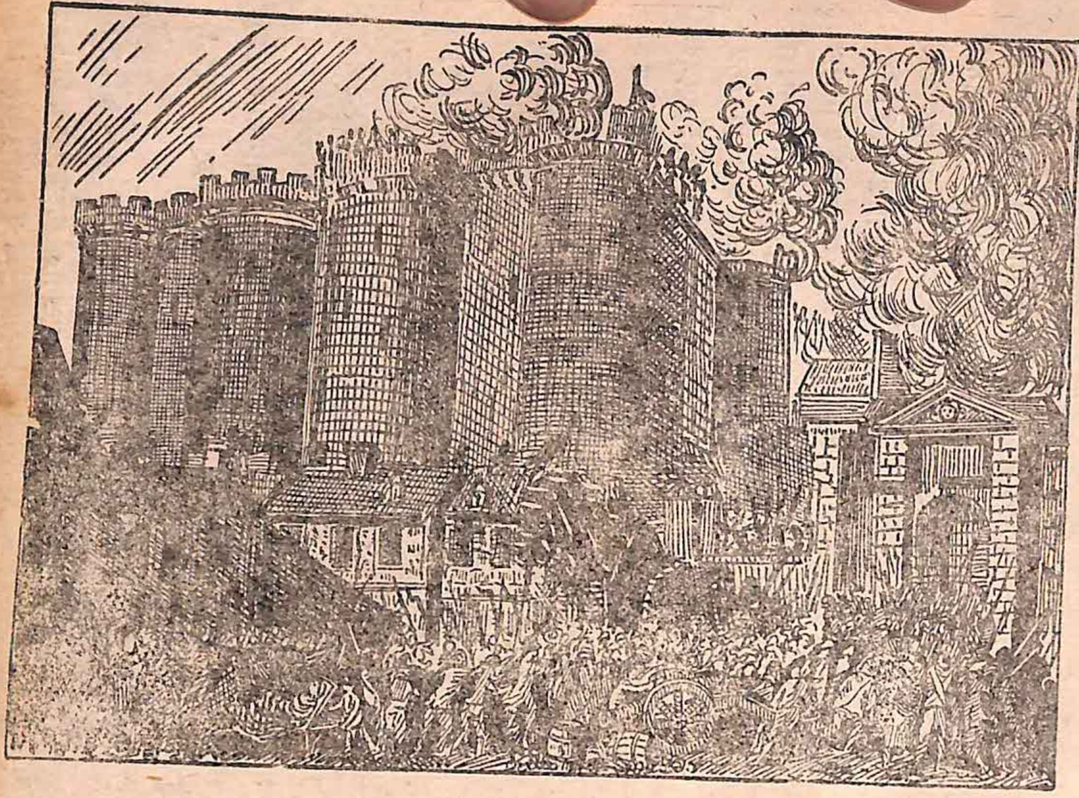
টেনিস কোর্টে শপথ গ্রহণ

প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। স্টেট্স্ জেনারেল জাতীয় সভা বা ন্যাশনাল এসেম্বলী বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং সংবিধান রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

জন বিক্ষোভ ঃ এদিকে রাজার দুর্মতি ঘুচিল না। তিনি জাতীয় সভা ভাঙিয়া দেওয়ার ফন্দি করিয়া প্যারি ও ভার্সাইর উপকণ্ঠে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। এই আসন্ন সঙ্কট হইতে রাষ্ট্রসভাকে রক্ষা করিল প্যারির জনতা। প্যারি নগরীতে ছিল কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ। ইহা ছিল একাধারে জেলখানা ও সেনাবাস। কত দেশসেবক ও নির্দোষ ব্যক্তি যে রাজার অথবা সুবিধাভোগীদের কোপে পড়িয়া এখানে পচিয়া মরিয়াছে তাহার হিসাব নাই। জাতীয় সভা ভাঙিবার জন্য যে সৈন্য আনা হইয়াছে তাহাদের ঘাটি বুঝিবা এখানেই হইবে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ক্ষিপ্ত জনতা এই দুর্গের উপর চড়াও হইয়া সান্ত্রীদিগকে হত্যা করিল, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল। রাজা ও তাঁহার দলের লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। রাষ্ট্রসভা রক্ষা পাইল। এজন্য ফরাসীরা আজও ১৪ই জুলাই জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে।

কালবিলম্ব না করিয়া প্যারির অধিবাসীরা এক পৌর সরকার ও জাতীয় বাহিনী সৃষ্টি করিল। নগরে নগরে প্যারির অনুকরণে সরকার ও বাহিনী গঠিত হইল। আর সুযোগ বুঝিয়া গ্রামের কৃষাণরা অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। জমিদারের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া, দলিলপত্র পোড়াইয়া, আমলাদিগকে পিটাইয়া তাহারা সাত দিনের মধ্যে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া ফেলিল।

জাতীয় সভা সঙ্গে সঙ্গে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন গ্রহণ করিল। অভিজাতদের সুবিধা, ভূমিদানপ্রথা, উচ্চশ্রেণীর খাজনামুকুব, চার্চের কর ও আবোয়াব তুলিয়া দেওয়া হইল। জাতীয় সভা রাজপতাকা সরাইয়া গ্রহণ করিল ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। ইংলণ্ডের বিল



বাস্তিল দুর্গের পতন

অফ্ রাইট্স্ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার অনুকরণে এক ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হইবে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—এই তিন মূলমন্ত্রের উপর রচনা হইবে নূতন ফরাসী রাষ্ট্র।



রাণী মারী আঁতোয়ানেৎ

কিন্তু এই সমস্ত বৈপ্লবিক প্রস্তাবে রাজা সম্মতি দিলেন না। সুবিধাভোগীরা মিলিয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে দল পাকাইল। ইহাদের

পিছনে দাঁড়াইলেন রাণী মারী আঁতোয়ানেৎ এবং রাজাকে কুবুদ্ধি দিতে লাগিলেন। এদিকে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গুজব রটিল যে ভার্সাইর রাজপ্রাসাদে বিরাট ভোজসভা বসিয়াছে। প্যারি হইতে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নারীর মিছিল চলিল ভার্সাইর দিকে, পিছনে বেকার ও দুরন্ত জনতা। তাহারা প্রাসাদের উপর চড়াও হইল, রক্ষীদিগকে হত্যা করিল, তারপর গোটা রাজপরিবারকে ধরিয়া আনিল প্যারিতে। প্যারির প্রাসাদে তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার পথে মেয়েরা চীৎকার করিতে লাগিল "আমরা আমাদের পাচক, পাচিকা ও পাচকপুত্রকে ফিরাইয়া আনিতেছি।" অর্থাৎ প্রজাদিগকে খাওয়াইবার দায়িত্ব রাজার। অভুক্ত প্রজাদিগকে ফেলিয়া পলাইবার অধিকার রাজপরিবারের নাই। ইহার কিছুদিন পরে জাতীয় সভাও প্যারিতে চলিয়া আসিল। প্যারির জনতার সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে রাষ্ট্রসভার কাজ চলিতে লাগিল।

শাসন সংস্কার ঃ কিছুটা শান্ত অবস্থার মধ্যে বসিয়া জাতীয় সভা নয়া সংবিধান রচনা করিল। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করা হইল না কিন্তু রাজার ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হইল। এক বছর অন্তর নির্বাচিত এক আইনসভার উপর আইন করিবার ও খাজনা তুলিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। জাতীয় সভা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদেশ ভাগ করিল, বিচারপদ্ধতির ও দণ্ডবিধির সংস্কার করিল, সামরিক পদ সকল শ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিল। সর্বশেষে চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া আইন পাশ করিল যে পাদরিরা চার্চের দ্বারা নিযুক্ত হইবে না, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

এই শেষোক্ত বিধানে ক্যাথলিকদের ধর্মবোধে ঘা লাগিল। অনেকে বিপ্লববিরোধী দলে যোগ দিল। রাজা ইহাতে ভয়ে ভয়ে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু আর বনিবনা করিয়া চলিতে পারিলেন না।

ইতোমধ্যে একদল যাজক ও অভিজাত পলাইয়া গিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার রাজাদিগকে উস্কাইতেছিল বিপ্লবীদিগকে দমন করিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ও সামন্তপ্রথা ফিরাইয়া আনিবার জন্য। এবার রাণীর পরামর্শে রাজাও সেই পথ ধরিলেন। গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে প্যারি হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা পূর্বদিকে চলিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা ধরা পড়িয়া গেলেন। জনতার টিট্‌কারির মধ্যে তাঁহাদিগকে প্যারিতে ফিরাইয়া আনা হইল। রাজবংশের মানমর্যাদা আর রহিল না।

প্রজাতন্ত্র ঃ এতদিন বিপ্লবীরা ছিল রাজতন্ত্রের সমর্থক। লাফায়েৎ, মিরাবো প্রভৃতি নরমপন্থী নায়কগণ রাজার প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট করিতে চান নাই। রোব্‌স্‌পীয়ের, দাঁতো, মারা প্রভৃতি চরমপন্থীরাও এতদিন রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন রাজার অভিসন্ধি ধরা পড়িল। তিনি দেশদ্রোহী ও বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে চান। জেকোবিন প্রভৃতি চরমপন্থীদলের প্রভাব বাড়িতে লাগিল। চরমপন্থীরা রাজতন্ত্রে বিশ্বাস হারাইয়া প্রজাতন্ত্রের কথা বলিতে লাগিল। এমন সময়ে জাতীয় সভার মিয়াদ শেষ হইল। নূতন সংবিধান অনুযায়ী আইনসভা নির্বাচিত হইল।

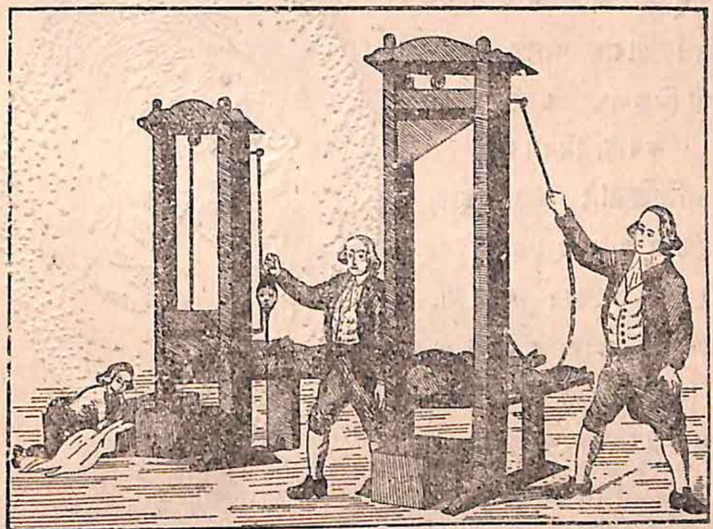
এদিকে পলাতক যাজক ও অভিজাতরা ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে গিয়া এক বিপ্লব-বিরোধী ফৌজ গঠন করিল। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার রাজরাজন্যদের মনে আতঙ্ক হইল বুঝিবা বিপ্লবের বীজাণু তাঁহাদের দেশেও ছড়াইয়া পড়ে এবং রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে। ফ্রান্সের বিপ্লবীরা দেখিল গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুরা মিলিয়া বিপ্লব ধ্বংস করিবার চক্রান্ত করিতেছে। দুই দলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শত্রুপক্ষের সেনাপতি ঘোষণা করিলেন যে, রাজপরিবারের

কেশাগ্র স্পর্শ করিলে তিনি আর প্যারির চিহ্ন রাখিবেন না'। এই উদ্ধত উক্তিই রাজপরিবারের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। প্যারির বারুদ-স্তূপে যেন আগুন লাগিল। ক্ষিপ্ত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল, রক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া রাজা ও রাণীকে বন্দী করিয়া আনিল।

এই চরম জাতীয় সঙ্কটের সময়ে ফ্রান্সে এক অপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিল। সারা দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সেনাদলে ভর্তি হইল। দলে দলে ফ্রান্সের যুবশক্তি প্যারির দিকে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল। তাহাদের কণ্ঠে প্রাণমাতানো বিপ্লবের গান—মার্সেলেজ্। আজও ইহা ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত হইয়া আছে। জাগ্রত জনশক্তি আক্রমণকারীদিগকে রুখিয়া ফ্রান্সকে ও বিপ্লবকে রক্ষা করিল।

প্যারির উত্থান ও জনজাগরণের পিছনে ছিল জেকোবিনদের তৎপরতা। তাহারা প্যারির পৌরসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া এক বিপ্লবী কমিউন গঠন করিল, আইনসভাকে দিয়া জোর করিয়া রাজাকে অপসারণ করাইল; তারপর আইনসভা তুলিয়া দিয়া নূতন করিয়া সংবিধান রচনা করিবার জন্য এক জাতীয় সম্মেলন বা কন্‌ভেন্‌শন আহ্বান করিল। ১৭৯২ হইতে ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় কন্‌ভেন্‌শনের শাসন চলিল। এই তিন বছরে কন্‌ভেন্‌শন্ রাজতন্ত্র দূর করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিল, এক অস্থায়ী সরকার গঠন করিয়া ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হইল, আক্রমণকারী রাষ্ট্রজোটকে পরাজিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিল এবং চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও দলাদলি সামলাইয়া লইয়া বিপ্লবী ঐক্য অব্যাহত রাখিল। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া কন্‌ভেন্‌শন যে অমানুষিক বর্বরতা ও অত্যাচারের আশ্রয় লইল তাহা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভীতির রাজত্বঃ অবশ্য সমস্যাও ছিল মারাত্মক। পূর্বদিক হইতে অস্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার সেনা প্যারির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিপ্লব-বিরোধী উত্থান শুরু হইয়াছে। দেশের ভিতর অগণিত গৃহশত্রু ষড়যন্ত্র করিতেছে। কন্‌ভেন্‌শনের মধ্যে চলিতেছে রাজনৈতিক দলাদলি। এক সুকঠিন কেন্দ্রীয় সরকারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। চরমপন্থীরা কমিউন ও কন্‌ভেন্‌শনের মারফত এরূপ এক সরকার গঠন করিল



গিলোটিন

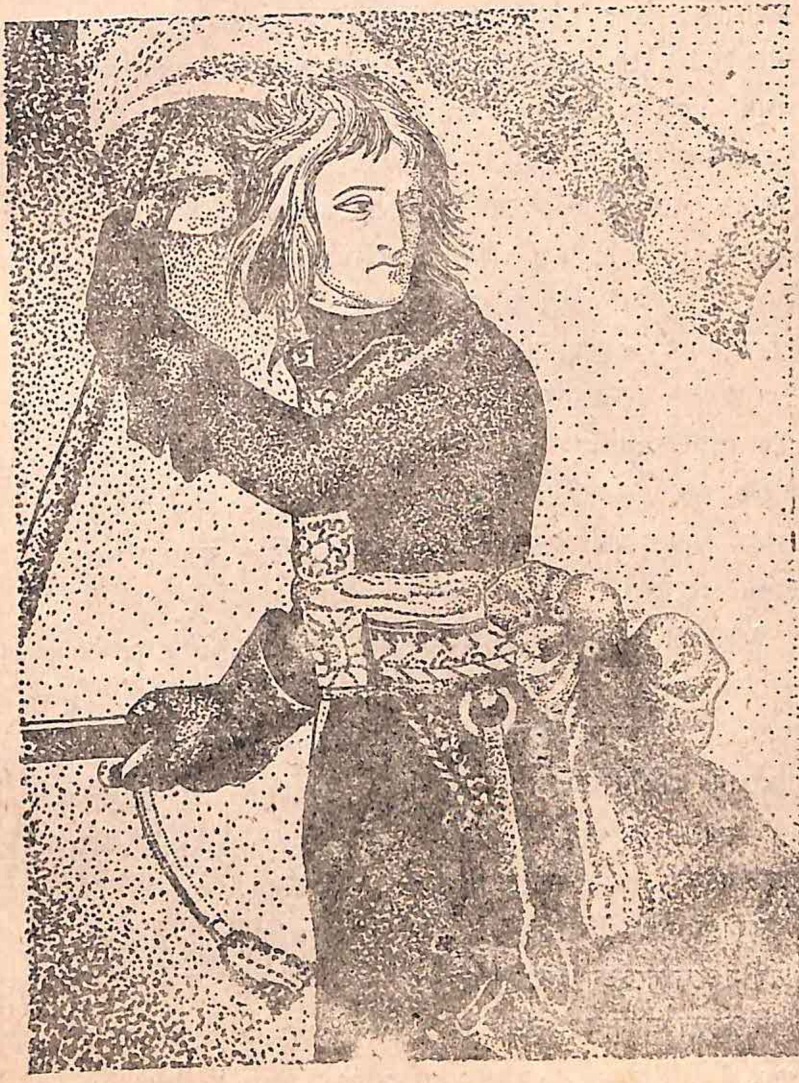
এবং বিরোধীদিগকে দমন করিবার জন্য এক বীভৎস ভীতির রাজত্বের প্রবর্তন করিল। ইহার প্রতীক হইল 'গিলোটিন' নামে এক ভয়ঙ্কর বধযন্ত্র। অতি সংক্ষিপ্ত নামমাত্র বিচারের পর এই যন্ত্র দিয়া বিরোধীদের মুণ্ডপাত করা হইত। ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ সালের পনর মাসের মধ্যে ২৬০০ জনের প্রাণদণ্ড হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান

হইলেন রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী মারী আঁতোয়ানেৎ। শত্রু নিপাত হইয়া যাওয়ার পর সন্ত্রাসরাজ রোব্‌স্‌পীয়ের নিজ সহকর্মীদিগকে ধরিয়া বলি দিলেন। জেকোবিন দলের দিক্‌পালরা একে একে ঘায়েল হইলেন। তারপর আসিল দাঁতোর পালা—অপরাধ, তিনি হত্যার তাণ্ডব বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন! শেষে কন্‌ভেন্‌শনের সভ্যরা রোব্‌স্‌পীয়েরকে ধরিয়া গিলোটিনে তাঁহার মাথা কাটিল! ভীতির রাজত্বের অবসান করিয়া নরমপন্থীরা শাসনভার গ্রহণ করিল। প্রবাদ আছে বিপ্লব-রাক্ষসী নিজ সন্তানদিগকে ভক্ষণ করে। কথাটা মিথ্যা নয়।



রোব্‌স্‌পীয়ের

প্রতিক্রিয়া: নরমপন্থীরা কন্‌ভেন্‌শন হাতে পাইয়া সংবিধানের সংস্কার করিল, জনতার অধিকার কমাইয়া দিল, কিন্তু রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিল না। দেশের সমস্যা সমাধানে তাহারা বিশেষ তৎপরতা দেখাইতে পারিল না। রাজহত্যার পর ইংলণ্ড, রুশ, হল্যাণ্ড, স্পেন এবং জার্মান ও ইটালীয় রাজ্যগুলি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়াছিল। এদিকে রাজতন্ত্রবাদী ও চরমপন্থীরা শাসনযন্ত্র দখল করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। নরমপন্থীরা এই বিষম অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিল না। ১৭৯৫ সালে কন্‌ভেন্‌শনের মিয়াদ শেষ হইল। নয়া সংবিধান অনুসারে পাঁচজন ডিরেক্টর ও দু'টি আইনসভা শাসন হাতে লইল।



ইতালীর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন

এই সন্ধিক্ষণে ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে এক দুঃসাহসী তরুণ সেনাপতির উদয় হইল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রাজতন্ত্রবাদিদের আক্রমণ হইতে কন্‌ভেন্‌শনকে বাঁচাইবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। অপূর্ব সাহস ও কৌশলে ইতালীর সংগ্রাম চালাইয়া তিনি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিভার বলে শীঘ্রই তিনি উচ্চতম সামরিক পদে উন্নীত হইলেন এবং ফ্রান্সকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তাঁহার ছিল অদম্য উচ্চাভিলাষ ও প্রভুত্বলিপ্সা। ১৭৯৯ সালে তিনি আইনসভা ও ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিয়া সরকার করায়ত্ত করিলেন। দশ বছরের ভিতর এই চতুর্থবার নূতন সংবিধান রচনা করা হইল। নেপোলিয়নের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। পাঁচ বছর পরে প্রজাতন্ত্রের প্রহসন শেষ করিয়া তিনি সম্রাট হইয়া বসিলেন। তাঁহার সামরিক শক্তির বলে তিনি যেমন ফ্রান্সের অধীশ্বর হইলেন তেমন প্রায় সমস্ত ইয়োরোপকে পদানত করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন।

ফরাসীরা নেপোলিয়নের অধীনে বহু রক্তপাতে অর্জিত স্বাধীনতা হারাইল বটে, কিন্তু বিপ্লবের অবদান একেবারে নষ্ট হইল না। স্বাধীনতার অবসান ঘটাইলেও নেপোলিয়ন সাম্যের নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তিনি ফ্রান্সে সামন্তব্যবস্থার বৈষম্য ফিরাইয়া আনিলেন না। শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা বিহিত হইল। আইনের চোখে সকলে সমান মর্যাদা পাইল। দেশের আইনকানুন সঙ্কলন করা হইল, যাহাতে সকলে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে।

বিপ্লবের অবদান ঃ রিনাইসেন্স ও রিফর্মেশনের মত ফরাসী বিপ্লবও ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছে। ইহার পূর্বে ইয়োরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

ও যাজক-অভিজাতদের সুযোগসুবিধা। ইহার পরে উনবিংশ শতকে বৈপ্লবিক ভাবনা ও আন্দোলনের প্রভাবে এই ব্যবস্থার ভাঙন ধরিল। ফ্রান্সের মত স্বেচ্ছাচার ও সমাজ-বৈষম্য অল্পবিস্তর ইয়োরোপের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সীমান্ত পার হইয়া দ্রুত দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। নেপোলিয়নের হাতে এবং নেপোলিয়নের পতনের পর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাধা পাইল বটে কিন্তু এ বিঘ্ন সাময়িক। অদূর ভবিষ্যতে ফরাসী বিপ্লব যেন ইয়োরোপে পুনর্জীবন লাভ করিল এবং জন-আন্দোলনের বলে চিরকালের মত রাজা ও অভিজাতদের স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটাইল। একে একে সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

কালক্রম

১৭৮৯	স্টেট্‌স্ জেনারেল আহ্বান, বাস্তিল আক্রমণ, নয়া সংবিধান ও শাসন সংস্কার
৯১	রাজা-রাণীর পলায়নের চেষ্টা
৯২	যুদ্ধ, বিপ্লব-বিরোধী উত্থান, জেকোবিন উত্থান, কমিউন ও কন্‌ভেন্‌শন, প্রজাতন্ত্র ঘোষণা
৯৩	রাজা ও রাণীর প্রাণদণ্ড
৯৩-৯৪	ভীতির রাজত্ব
৯৫	কন্‌ভেন্‌শনের মিয়াদ শেষ, ডাইরেক্টরী
৯৯	নেপোলিয়নের একনায়কত্ব
১৮০৪	সাম্রাজ্য ঘোষণা
১৫	নেপোলিয়নের পতন

ফ্রান্সে যখন বিপ্লবের আঘাতে রাজতন্ত্র ও সামন্ত প্রথা ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন ইংলণ্ডে আর একটি বিপ্লব আসিয়া অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছিল। ইহাকে বলে শিল্পবিপ্লব। ইহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে জীবনযাত্রা, উৎপাদন প্রণালী এবং চলাচলের ব্যবস্থা প্রচুর উন্নতি লাভ করিল। অবশ্য এ বিপ্লব ফ্রান্সের বিপ্লবের মত আকস্মিক ও চমকপ্রদভাবে ঘটে নাই। অলক্ষিতে ও নীরবে ঘটিয়াছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যন্ত্রের ব্যবহার, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে আসিয়াছে ব্যাপক রূপান্তর। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব হইতে জন্মলাভ করিয়াছে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতা।

সূচনা : অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ইহার মূল কথা হইল যন্ত্রের প্রয়োগে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের বিস্তার। ইংলণ্ডের ছিল অনেক সুবিধা। তাহার ছিল লোহা ও কয়লার খনি, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও উপনিবেশ, দেশের মধ্যে অবাধ পণ্য চলাচল। এত রকম সুযোগসুবিধা অন্য দেশে ছিল না। ফ্রান্স ছিল বিপ্লবে ও যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত, জার্মানী বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাত্র নবজাত। জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিরতা লাভ করিবার পর একে একে সব দেশের শিল্পেও বিপ্লব আসিল।

মধ্যযুগে পণ্যবিনিময়ের ক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। উৎপন্ন জিনিস দেশের বাজারে বিক্রি হইত, বিদেশে যাইত সামান্যই।

কারিগররা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও বিক্রির কাজ চালাইত। এমন সময়ে ষোড়শ শতকে আসিল সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশের প্রসার। আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্য দেশের উপনিবেশ ও কুঠি হইতে অগাধ বিত্ত আসিয়া জমিল একদল বেনিয়ার হাতে। তাহারা একদেশের জিনিস অন্যদেশে বিক্রি করিত আর উপনিবেশ হইতে নিজ দেশে আনিত সস্তা কাঁচা মাল। তাহারা বেতন দিয়া কিংবা কাজের চুক্তিতে কারিগর রাখিত, কারিগররা তাহাদের ফরমাস মত পণ্য তৈরী করিত। এই পণ্য দেশবিদেশে বেচিয়া বেনিয়ারা মোটা লাভ লুটিল। এই প্রকারে কারিগররা ক্রমশঃ স্বাধীনতা হারাইয়া মালিকের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল।

এই পরিবর্তন ত্বরায়িত হইল শিল্পবিপ্লবের দ্বারা। যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এতদিন চার্চের চাপে রুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রকাশ হইল, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনাকে মালিকরা কাজে লাগাইল, যন্ত্রপাতি বসাইয়া কারখানা খুলিল, অল্প সময়ে অল্প আয়াসে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন করিয়া দেশবিদেশে চালান দিল। যন্ত্রের কাজের সঙ্গে হাতের কাজ পাল্লা দিতে পারে না। কারিগরদের এমন মূলধনও নাই যে কারখানা খুলিবে। কাজেই তাহারা ব্যবসা গুটাইয়া মালিকের কারখানায় ভর্তি হইল। স্বাধীন জীবিকা হারাইয়া তাহারা হইল বেতনভোগী মজুর।

বস্ত্রশিল্প ঃ—ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের রূপান্তর ঘটিল ঠিক এই প্রকারে। আমেরিকায় ছিল ইংলণ্ডের উপনিবেশ। সেখানে ভাল তুলার চাষ হইত। কুঠির মালিকরা নিগ্রো দাস দিয়া চাষ করাইত, খরচ বেশী পড়িত না। ইংরাজ বেনিয়ারা সস্তা দামে এই তুলা দেশে আনিত, ল্যাঙ্কাশায়ারের ওস্তাদ তাঁতিদের ঘরে ঘরে বিলি করিত।

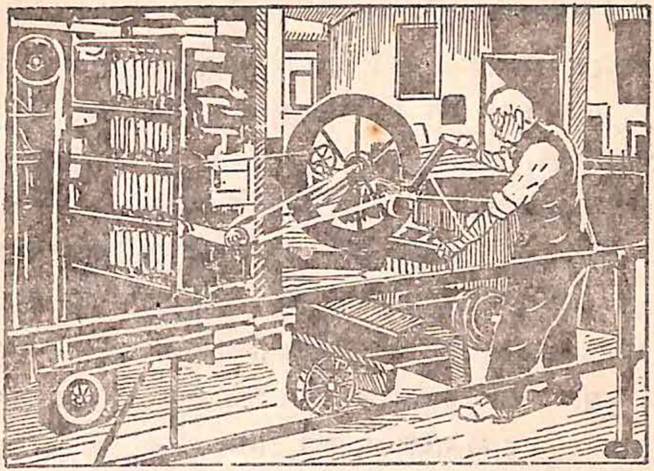
কিছু মজুরি লইয়া তাঁতিরা কাপড় বুনিয়া দিত। বেনিয়ারা এই কাপড় বিদেশে রপ্তানি করিত।

কাঁচা তুলা হইতে কাপড় বানাইতে কয়েকটি পদ্ধতির ভিতর দিয়া যাইতে হয়, প্রথমে বীজ হইতে তুলা ছাড়াইবার পাঁজ করিতে হয়, তারপর চরকায় পাঁজ হইতে সূতা কাটা হয় এবং শেষে সূতা দিয়া তাঁতে কাপড় বোনা হয়। এই সব কাজ তাঁতিরা হাতে করিত, তাহাতে অনেক সময় লাগিত। ১৭৩৩ সাল হইতে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গুটিকয়েক যন্ত্র আবিষ্কার হইল যাহাতে এসব কাজ সহজে ও অল্প সময়ে করা সম্ভব হইল। এই যন্ত্র চালাইতে হইত জলস্রোতের সাহায্যে। বেনিয়ারা নদীর ধারে কাপড়ের কল বসাইল। তাঁতিরা ঘর ছাড়িয়া আসিয়া এই কলের মজুর হইল।

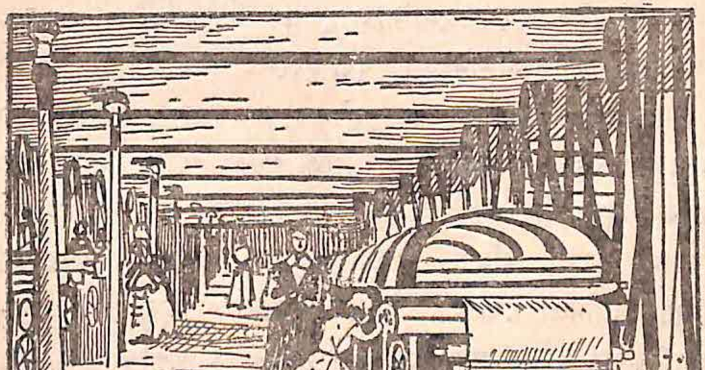


জেম্‌স্ ওয়াট্

জলশক্তির পরে বস্ত্র-শিল্পে বাষ্পশক্তির প্রয়োগ হইল। বাষ্পের নিয়ম ইহা অল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকিবে না, ঠেলিয়া বাহির হইবে। জল ফুটাইলে বাষ্প হয়, তখন ইহার চাপকে কাজে লাগাইতে পারিলে যন্ত্র চালানো যায়। প্রথমে কয়লাখাদ হইতে পাম্প করিয়া জল তুলিবার কাজে বাষ্পশক্তির ব্যবহার হইত। ১৭৬৯ সালে জেম্‌স্ ওয়াট্ বাষ্পশক্তির সাহায্যে চাকা ঘুরাইবার যন্ত্র বাহির করিলেন। এই বাষ্পযন্ত্র সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কাজে লাগানো হইল। বস্ত্রশিল্পকে আর নদীর উপর নির্ভর করিতে হইল না।



জলস্রোতে চালিত চরকায় সুতা কাটা হইতেছে



বাষ্পচালিত তাঁতে কাপড় বোনা হইতেছে

লোহা ও কয়লা : শিল্পবিপ্লবের মূল উপাদান লোহা ও কয়লা। লোহা হইতে ইস্পাত তৈরী হয়। লোহা ও ইস্পাত ছাড়া যন্ত্রপাতি, যানবাহন এমন কি আজকাল ঘরবাড়ি পর্যন্ত হয় না। মধ্যযুগে লোহা ব্যবহার হইত কম, ছোটখাট যন্ত্রপাতি যাহা ছিল তাহা কাঠের তৈয়ারী। ইহা বেশীদিন টিকিত না। লোহার যন্ত্র বেশীদিন টেকে। কিন্তু লোহার জিনিস গড়াইতে হইলে লোহা গলাইতে হয়, তার জন্য উত্তপ্ত চুলার দরকার। প্রথম প্রথম কাঠ জ্বালাইয়া লোহা গলান হইত। কিন্তু এই রাবণের চিতার কাঠ জুটিবে কোথায় ? লোহার চুল্লীর কাঠ যোগাইতে যোগাইতে ইংলণ্ডের জঙ্গল সাফ হইয়া গেল। জ্বালানী লইয়া গবেষণা চলিল। কাঠ ও কাঠঁকয়লা কাজ চালাইবার :জন্য আবিষ্কার হইল পাথুরে কয়লা। প্রকাণ্ড চুল্লীতে কয়লার আগুন দিয়া লোহা গলান হইল। জল ফুটাইয়া বাষ্প করাও সহজ হইল।

কয়লাখনির আশেপাশে উঠিল লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। দেখা দিল ছুটি নূতন সমস্যা। বর্ষা হইলেই খাদে জল ঢুকিয়া খনির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। জল তুলিবার জন্য পাম্প লইয়া গবেষণা চলিল। ১৬৯৮ সালে বাষ্পচালিত জলের পাম্প বাহির হইল, খাদের সমস্যা মিটিল। দ্বিতীয় সমস্যা খনি হইতে কারখানায় অবিরাম কয়লা বহিয়া লওয়া। প্রথম প্রথম কয়লার গাড়ি টানিয়া আনিত ঘোড়া। ইহাতে অনেক অসুবিধা। আবার বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামাইতে লাগিলেন—বাষ্পশক্তি দিয়া গাড়ি চালানো যায় কিনা। ফলে আবিষ্কার হইল বাষ্পযান বা স্টীম ইঞ্জিন।

লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে দেশ ছাইয়া গেল। যন্ত্রের বলে অন্যান্য ধাতুর কাজ আয়ত্ত হইল। প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ কাজে

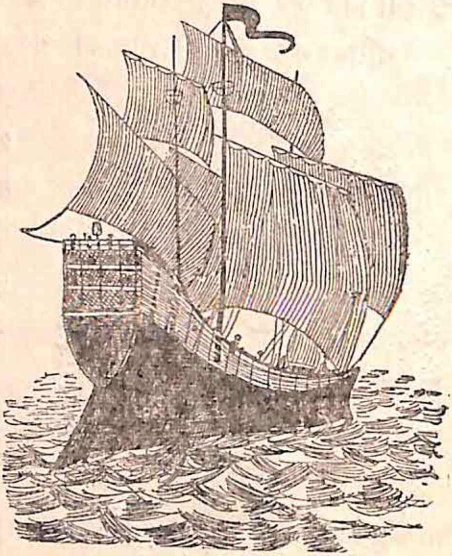
লাগাইবার নূতন পথ বাহির হইল। জীবনে ভোগের উপকরণ সুখ-সুবিধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

পরিবহন : পণ্য উৎপাদনের পর প্রয়োজন হয় পণ্য চলাচলের। বড় বড় কলকারখানা সর্বত্র হয় না, সুবিধামত দু'চার জায়গায় হয়। কারখানার উৎপন্ন জিনিস দেশবিদেশের বাজারে চালান যায়। সুতরাং পণ্য চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট ও যানবাহনের প্রয়োজন। সভ্য জীবনের পক্ষেও যাতায়াতের সুবিধা থাকা নিতান্ত দরকার। এতদিন মানুষ ও মাল চলাচল করিত কাঁচা রাস্তায় ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কিংবা নদীনালায় পালতোলা দাঁড়-টানা জাহাজে। ইহাতে বেশী লোক ও জিনিস একসঙ্গে যাইতে পারিত না, যাতায়াতের সময়ও লাগিত অনেক। এখন কয়লাখনি, কারখানা ও বাজার-বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া পাকা রাস্তা তৈয়ারী হইল ও খাল কাটা হইল। ম্যাকাডাম পিচ ও পাথরকুঁচি দিয়া রাস্তা বাঁধাইবার প্রণালী বাহির করিলেন, রাস্তার দুই ধারে জল সরাইবার নালি কাটাইয়া রাস্তা মজবুত করিলেন।

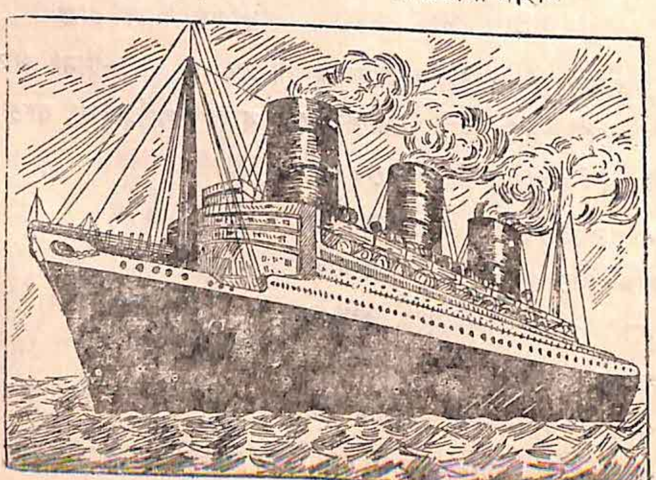

জর্জ ষ্টিফেনসন


ষ্টিফেনসনের ইঞ্জিন ও গাড়ি

ঘোড়ার গাড়ি ও দাঁড়ি নৌকা বাতিল হইল বাষ্পশক্তির প্রয়োগে। ইতঃপূর্বে বাষ্প দিয়া জলের পাম্প ও সুতাকল চালানো হইয়াছিল। এবার চাকা ঘুরাইয়া ইঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা হইল। ১৮০৪ সালে রিচার্ড ট্রেভিথিক্ ওয়েল্‌স্-এর খনি অঞ্চলে প্রথম রেল ইঞ্জিন চালাইলেন। ১৮২৫ সালে জর্জ স্টিফেনসন ইংলণ্ডে প্রথম যাত্রি ও পণ্যবাহী রেলগাড়ির প্রচলন



পালতোলা জাহাজ



বাষ্পচালিত জাহাজ

করিলেন। বাষ্পের চাপে চাকা ঘুরাইয়া জাহাজও চালানো হইল। জল কাটিবার জন্য চাকার গায়ে দাঁড় লাগাইয়া দিলেই জাহাজ চলিবে। জলপথে মাল ও যাত্রী লইয়া বাষ্পজাহাজ চালাইলেন আমেরিকান যন্ত্রবিশারদ রবার্ট ফুলটন।

ইহার পর উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাহির হইল বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুতের বলে আরো অনায়াসে যন্ত্র ও গাড়ি চালানো হইল, বাতি জ্বলিল, পাখা ঘুরিল। শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হইল আরো দ্রুত।

কৃষি: শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে চাষেরও উন্নতি হওয়া দরকার কারণ জমি চাষ করিয়া তুলা, পাট, তেলের বীজ প্রভৃতি কাঁচা মাল এবং মানুষের আহার জোটে। কৃষিজাত পণ্য ও খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ার ফলে জমির দাম বাড়িল। পতিত জমি উদ্ধার করিয়া এবং ছোট ছোট জমি হইতে চাষীদিগকে উৎখাত করিয়া জমিদাররা বড় বড় চাষবাড়ি গড়িল। খামারে চাষের যন্ত্র লাগাইয়া, কারখানায় তৈয়ারী সার দিয়া এবং ভাল জাতের পশু, সবজি ও শস্য আনিয়া তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আরম্ভ করিল। কোথাও কোথাও কারবারীরা জমিদারদের কাছ হইতে জমি লীজ লইয়া লোক লাগাইয়া চাষ আবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে কাঁচামাল ও খাদ্যের অভাব মিটিল বটে কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে একদল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বেকার উদ্‌বাস্তু কৃষাণের উদ্ভব হইল।

পরিণাম: শল্প-বিপ্লবের পরিণাম যে সব দিক দিয়া ভাল হইয়াছে তা' নয়। প্রাকৃতিক শক্তি ও যন্ত্রের প্রয়োগে পণ্য উৎপাদনের কাজ সহজ হইয়াছে ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। জিনিসপত্র সস্তা হইয়াছে, যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, ভোগের উপকরণ বাড়িয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে জীবনযাত্রার

মান অনেক উন্নত হইয়াছে। দু'শ' বছর আগে রাজাবাদ্‌শারাও দিল্লী হইতে কলিকাতায় দেড়মাসের কমে আসিতে পারিতেন না। আজকাল কুলিমজুরও দেড় দিনে দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিতে পারে।

কিন্তু অন্যদিকে কলকারখানা কারিগরদের জীবনে তুমুল বিপর্যয় আনিয়াছে। এতদিন কারিগর ছিল স্বাধীন। সে যখন খুশি কাজ করিত, যখন খুশি বিশ্রাম করিত। গোটা জিনিসটা সে নিজহাতে গড়িত, তাহার বুদ্ধি ও কৌশল খাটাইত আর জিনিসটি বেচিয়া পুরা লাভ নিজে ভোগ করিত। এখন সে হইল কারখানার মজুর, মালিকের বেতনভোগী ভৃত্য। তাহাকে পশুর মত খাটিতে হয়। অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করে, প্রত্যেকের কাজ ভাগ করা আছে। যন্ত্রই কাজ করে, সে শুধু যন্ত্রের খোরাক যোগায়, চাহিদা মিটায়। কোনরূপ হাতের নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ নাই। যন্ত্রের পাশে দাঁড়াইয়া মজুরও যন্ত্রের মতই কাজ করিয়া যায়।

এই নূতন প্রথা সমস্ত সমাজব্যবস্থা ওলট-পালট করিয়া দিল। এতদিন সভ্যতা ছিল গ্রাম্য ও কৃষিপ্রধান, এবার সভ্যতা হইল শহুরে ও শিল্পপ্রধান। গ্রামের উদ্‌বাস্তু চাষীরা শহরের শিল্পাঞ্চলে আসিল কাজের খোঁজে। বণিক, চাকুরে, মজুর, সব আসিয়া শহরে ভিড় করিল। এদিকে বেকারসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শ্রম বাঁচাইবার জন্যই ত' যন্ত্র, অতএব কম শ্রমিক দিয়া কাজ চালানোই কারখানার বিশেষত্ব; উঠ্‌তির সময়ে বেশী মজুর নেওয়া হয়, আর পড়্‌তির সময়ে ছাঁটাই করা হয়। তাই কারখানার কাজ অনিশ্চিত। মজুররা দিনে বার-তের ঘণ্টা খাটে। তাহাদের মধ্যে মেয়েরা ও শিশুরাও আছে। তাহারা খাটে পুরুষের চেয়ে কম মজুরীতে, তাতে মালিকের লাভ। মজুররা থাকে বস্তিতে। সেখানকার ঘরগুলি

ও পথঘাট যতদূর হইতে হয় নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। একদিকে এই দারিদ্র্য, অন্যদিকে কারখানার মুষ্টিমেয় মালিক লাভের মোটা অংশ পাইয়া ফুলিয়া উঠিল। শিল্পবিস্তারের ফলে দেশের যা ধনসম্পদ বাড়িল তা জমা হইল এই ধনীদের ভাণ্ডারে। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বাড়িতে লাগিল, মালিক ও মজুরের শ্রেণীবিরোধ আরম্ভ হইল। প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ করায়ত্ত করিয়া মানুষ যেমন জীবনের মান উন্নত করিয়াছে তেমন অনেক সমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছে।

পরে এই বৈষম্য কমাইবার জন্য এবং মজুরদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিছু কিছু আইন পাশ হইল। কোন কোন শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনা রাষ্ট্র নিজের হাতে লইল। যেমন রেলপথ আজকাল প্রায় সবদেশেই সরকারের হাতে আছে।

শিল্পবিপ্লবের আসল কীর্তি প্রকৃতির উপর মানুষের জয়লাভ। পুরাকালে মানুষ বন্যা ও বিদ্যুৎ দেখিয়া ভয় পাইত। সে প্রাকৃতিক শক্তিকে ভূত অথবা দেবতা মনে করিয়া পূজা করিত। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলে ক্রমে ক্রমে সে এইসব শক্তিগুলিকে চিনিয়া ফেলিল এবং বশ করিল। এই কাহিনীরই একটি বিরাট অধ্যায় শিল্পবিপ্লব।

কালক্রম

১৬৯৮	জলের পাম্পে বাষ্পযন্ত্র
১৭৬৯	কাপড়ের কলে বাষ্পযন্ত্র
১৭৮৭	জাহাজে বাষ্পযন্ত্র
১৮০৪	রেল-ইঞ্জিনে বাষ্পযন্ত্র
১৮০৭	প্রথম যাত্রীবাহী স্টীমার
১৮২৫	প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি

ফরাসী বিপ্লবের বহু অবদানের মধ্যে যে ধারণাটি ইয়োরোপের জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল সে হইল জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ। প্রত্যেক জাতি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করিবে, কেহ অপরের অধীন থাকিবে না, দেশে দেশে এই দাবি লইয়া আন্দোলন শুরু হইল। এই জাতীয়তার ভাব ক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। উনবিংশ শতকে জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ইয়োরোপের দুইটি প্রধান আধুনিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করিল,—ইটালী ও জার্মানী। বহুকাল যাবৎ ইটালীয় ও জার্মানরা ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত। নেপোলিয়নের আক্রমণের আঘাতে এই দুই জাতি প্রথম জাতীয় ঐক্য অর্জন করিবার প্রেরণা পাইল।

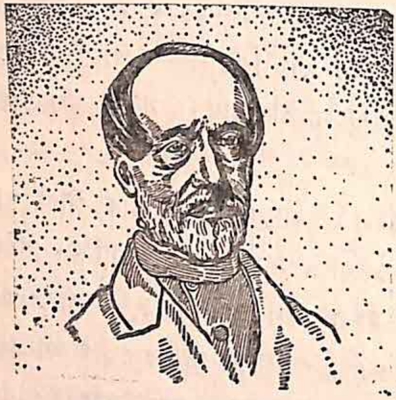
ইটালী :—ইটালীতে ছিল বহু ছোট ছোট রাজ্য। কোথাও কোথাও বিদেশী রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন ইটালী জয় করিলেন, তাঁহার এক আত্মীয়কে নেপ্‌লস ও সিসিলীর সিংহাসনে বসাইলেন। আর পোপের রাজ্য ব্যতীত বাকি অংশ লইয়া তিনি ইটালী রাজ্য গঠন করিলেন এবং নিজে তাহার রাজা হইলেন। স্বাধীনতা না পাইলেও ইটালীর অধিকাংশ সাময়িকভাবে জাতীয় ঐক্য লাভ করিল। নেপোলিয়ন আইনকানুন এবং শিল্প-বাণিজ্যেরও অনেক সংস্কার করিলেন। এক অর্ধমৃত জাতির দেহে প্রাণসঞ্চার হইল।

নেপোলিয়নের পতনের পর শান্তি-বৈঠক বসিল। ভিয়েনার বন্দোবস্তে সর্বত্র আগেকার অবস্থা ফিরাইয়া আনা হইল। ইটালীকে আবার ভাঙিয়া দশটি রাজ্যে ভাগ করা হইল। ইহার মধ্যে লম্বার্ডি-ভেনিশিয়া রহিল অস্ট্রিয়ার অধিকারে এবং পিড্‌মণ্ট ও পোপের রাজ্য ব্যতীত বাকি সবগুলি হইল অস্ট্রিয়ার তাঁবেদার। সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসিল।

ইটালীতে আন্দোলন শুরু হইল। আন্দোলনের দাবি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য। 'কারবোনারি' নামে এক গুপ্ত সমিতি গঠিত হইল। ১৮২০ সালে বিদ্রোহ হইল নেপ্‌লস্‌ ও পিড্‌মণ্ট-এ, ১৮৩০ সালে মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলিতে। দু'বারই অস্ট্রিয়ার ফৌজ আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। ১৮৪৮ সালে এই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করিল। তখন অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সবগুলি প্রদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে পিড্‌মণ্টের রাজার নেতৃত্বে ইটালীর রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল রাজাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও দলাদলি। একে একে সবগুলি প্রদেশ জয় করিয়া অস্ট্রিয়া আবার স্বেচ্ছাচার ও দমননীতি চালাইতে লাগিল।

ম্যাট্‌সিনি: কিন্তু মুক্তিকামী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতির আকাঙ্ক্ষাকে পশুবলে দমন করা যায় না। ইটালীয়দের বুকে সাহস ও আশার আলো জ্বালিলেন বিপ্লবগুরু ম্যাট্‌সিনি। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা, একতা ও গণতন্ত্রের মূর্তিমান আদর্শ। তিনি প্রথমে 'কারবোনারি' নামক গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। অস্ট্রিয়ার পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। ছয় মাস পরে মুক্তি পাইয়া তিনি দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। জীবনের বাকী চল্লিশ বছর তাঁহাকে বিদেশে অভাবের মধ্যে কাটাইতে হইল।

১৮৩১ সালে জেল হইতে বাহির হইয়া ম্যাট্‌সিনি 'তরুণ ইটালী' নামে এক দল গঠন করিলেন। ইতঃপূর্বে কারবোনারির বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা ছিল কেবল ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসের দিকে, সংগঠন ও প্রচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত জাতির মনে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অটল আত্মবিশ্বাস আনিতে হইবে এবং সর্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিবার প্রেরণা জাগাইতে হইবে। এ কাজ তরুণদের। তরুণরাই জাতীয়তার ধর্ম দিকে দিকে প্রচার করিবে, সংগ্রামী জনতার নেতৃত্ব লইবে। সুতরাং ম্যাট্‌সিনির দল গঠিত হইল তরুণদের লইয়া। দুই বছরের মধ্যে ইহার সভ্য হইল ষাট হাজার। ইহার লক্ষ্য হইল তিনটি : অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করিতে হইবে ; এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে ; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করিবে।



বিপ্লবগুরু ম্যাট্‌সিনি

ম্যাট্‌সিনির জ্বালাময়ী ভাষায় ও 'তরুণ ইটালী'র আবেদনে জাতির অন্তরে বিদ্যুতের স্পর্শ লাগিল। পরাজয়ের নৈরাশ্য দূরে সরাইয়া জনতা আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

কাভুর : ম্যাট্‌সিনির আদর্শকে রূপ দিলেন পিড্‌মণ্টের মন্ত্রী কাভুর। ম্যাট্‌সিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ, কাভুর ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি দেখিলেন শুধু উচ্ছ্বাস ও আদর্শ দিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে পারা

যাইবে না। অস্ট্রিয়াকে তাড়াইতে হইলে কূটনীতির খেলা খেলিতে হইবে। এজন্য তিনি তিনটি নীতি স্থির করিয়া লইলেন। প্রথমতঃ জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব করিবেন পিড্‌মণ্টের দেশপ্রেমিক রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল। কারণ পিড্‌মণ্টের রাজারা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে পিড্‌মণ্টের মিত্রতা করিয়া কাজ হাসিল করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা ও একতা লাভের পর ইটালীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে।


কাভুর

নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সম্রাট্। কাভুর তাঁহার সঙ্গে এক চুক্তি করিলেন। স্থির হইল ফ্রান্স ও পিড্‌মণ্ট অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইবে। জয়লাভ হইলে পিড্‌মণ্ট পাইবে লম্বার্ডি ও ভেনিশিয়া, ফ্রান্স পাইবে পিড্‌মণ্টের কিছু অংশ। ১৮৫৯ সালে ফ্রান্স ও পিড্‌মণ্টের বাহিনী অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিল। এমন সময়ে নেপোলিয়ন চুক্তি ভাঙ্গিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসিলেন। পিড্‌মণ্ট পাইল শুধু লম্বার্ডি। কিন্তু ইটালীর জনতা নেপোলিয়নের মুখ চাহিয়া বসিয়া রহিল না। মধ্য ইটালীর অধিবাসীরা নিজ নিজ অঞ্চলের রাজন্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পিড্‌মণ্টের সহিত মিলিত হইল।

গ্যারিবল্‌ডি: মধ্য ইটালী হইতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল সিসিলী দ্বীপে। এই জনবিদ্রোহ চালাইবার জন্য এক উপযুক্ত

সামরিক নেতার আবির্ভাব হইল। গ্যারিবল্‌ডি অল্প বয়সে 'তরুণ ইটালী' দলে ভর্তি হন। ১৮৩৪ সালে বিদ্রোহের অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া গিয়া সেখানকার বিদ্রোহে যোগ দেন। ১৮৪৮ সালে নিজের দেশে জন-অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং একদল স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করিয়া যুদ্ধে নামিলেন। ১৮৪৯ সালে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে পর ফরাসী ও অস্ট্রিয়া সেনা তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাড়া করিল। শত্রুর চোখে ধূলা দিয়া গ্যারিবল্‌ডি পাহাড়ে ও জঙ্গলে পলাইয়া বেড়াইতেন। এই অবস্থায় তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও সমর-সঙ্গিনী এনিটার মৃত্যু হইল। গ্যারিবল্‌ডি আবার নিরুদ্দেশ হইলেন।



গ্যারিবল্‌ডি

১৮৬০ সালে সিসিলীর জন-অভ্যুত্থান গ্যারিবল্‌ডিকে অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির করিয়া আনিল। সাড়ে এগার শ' লালকুর্তার এক স্বেচ্ছাবাহিনী লইয়া তিনি সিসিলীতে নামিলেন। তিন মাসের মধ্যে এই দ্বীপ করায়ত্ত করিয়া তিনি নেপ্‌ল্‌স্‌-এ উপস্থিত হইলেন,—রাজাকে তাড়াইয়া অর্ধেক ইটালী বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিলেন।

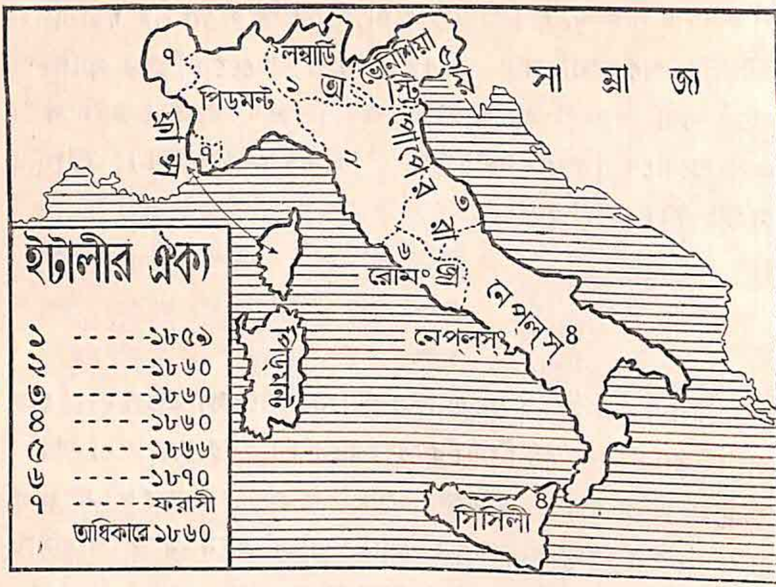
তখন উত্তরদিক হইতে পিড্‌মণ্টের বাহিনী পোপের রাজ্যে প্রবেশ করিল। পূর্বাঞ্চল দখল করিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল নেপ্‌ল্‌স্‌-এ গ্যারিবল্‌ডির সঙ্গে মিলিত হইলেন। নিজের কর্তব্য শেষ করিয়া গ্যারিবল্‌ডি আবার দূরে সরিয়া গেলেন।

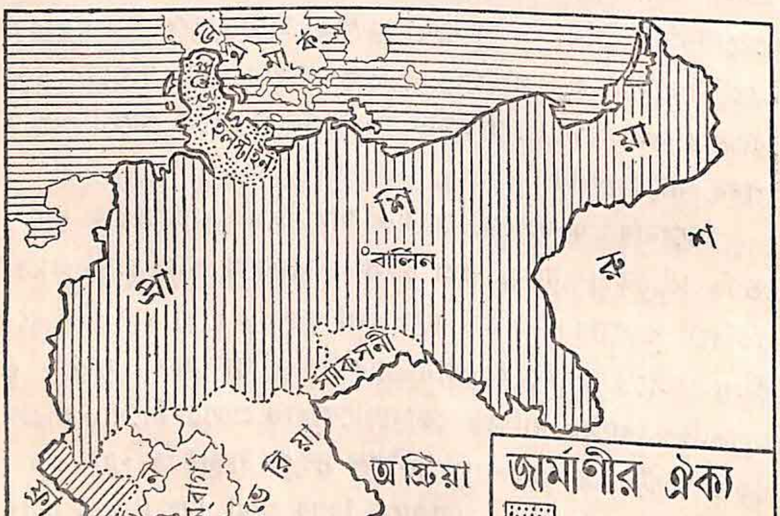
১৮৬১ সালের ১৭ই মার্চ স্বাধীন ইটালী রাজ্য ঘোষিত হইল

পাঁচ বছর পরে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার হাতে পরাস্ত হইলে পর ভেনিশিয়া ইটালীর হাতে আসিল। ১৮৭০ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার হাতে পরাস্ত হইয়া রোম হইতে ফরাসী সেনা সরাইয়া আনিলেন। এই সুযোগে ভিক্টর ইমানুয়েল রোম দখল করিলেন। ইটালীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হইল।

জার্মানী : জার্মানীর সমস্যা ছিল ইটালীর অপেক্ষা জটিল। ইহার রাজ্যসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ'র চেয়েও বেশী। ইহাদের মধ্যে প্রধান অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া। তাহাদের মধ্যে ছিল প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব। সবগুলি রাজ্য লইয়া গঠিত 'পবিত্র রোমসাম্রাজ্য' নামে মাত্র জার্মানীর ঐক্য রক্ষা করিয়াছিল, কারণ সাম্রাজ্যের কোন ক্ষমতা ছিল না। নেপোলিয়ন প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ভিন্ন বাকী রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া একটি জার্মান রাষ্ট্র গড়িলেন। কিন্তু জার্মান জাতি দাসত্বের ঐক্য বরদাস্ত করিল না। জার্মানীর জাতীয় উত্থান হইতে নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হইল।

ভিয়েনার বন্দোবস্তে আবার জার্মানীকে আটত্রিশটি রাজ্যে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করা হইল। রাজন্যরা অপ্রতিহত ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন। একটি ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্র খাড়া করা হইল বটে কিন্তু ইহাতে প্রজাদের কোন অধিকার রহিল না। সংহতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবিতে কোথাও কোথাও প্রজারা বিদ্রোহ করিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফৌজের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। ১৮৪৮ সালে জার্মানীর নানাস্থানে বিপ্লব দেখা দিল। প্রাশিয়াও বাদ গেল না। সকল রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক গণপরিষদে


ইটালীর ঐক্য
১ -----১৮৫৯
২ -----১৮৬০
৩ -----১৮৬০
৪ -----১৮৬০
৫ -----১৮৬৬
৬ -----১৮৭০
৭ -----ফরাসী অধিকারে ১৮৬০
লম্বার্ডি
ভেনিশিয়া
পিড্‌মন্ট
অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য
রোম
নেপলস
সিসিলি
ফ্রান্স


জার্মাণীর ঐক্য
-------১৮৬৪
-------১৮৬৭
-------১৮৭০
১৮৭০ ফ্রান্সের অংশ
প্রাশিয়া
বার্লিন
রুশ
স্যাকসনী
ব্যাভেরিয়া
অস্ট্রিয়া
ফ্রান্স
হলস্টাইন
ডেনমার্ক

সম্মিলিত হইলেন। গণপরিষদ জার্মানীর জন্য এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করিয়া প্রাশিয়ার রাজাকে ইহার সিংহাসনে নির্বাচন করিল। কতকটা অস্ট্রিয়ার ভয়ে, কতকটা গণতন্ত্রের ভয়ে প্রাশিয়ার রাজা জার্মানীর সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করিলেন। জার্মানীতে গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল।

১৮৬১ সালে প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রাশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করিতেছে সামরিক শক্তির উপর। তিনি সৈন্য ও রণসম্ভার বাড়াইবার এক পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু আইনসভা ব্যয় মঞ্জুর করিল না। এই অচল অবস্থায় পড়িয়া উইলিয়ম এক কূটবুদ্ধি দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রনায়ককে আনিয়া প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসাইলেন। ইহার নাম বিসমার্ক। ইহার হাতেই জার্মানী রাষ্ট্রীয় একতা লাভ করিল।

বিসমার্ক ঃ ১৮৪৯ সালে গণপরিষদের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া বিসমার্ক বলিয়াছিলেন "বক্তৃতা ও ভোটের জোরে জার্মানীর সমস্যার সমাধান হইবে না, সমাধান হইবে অস্ত্র ও রক্ত দিয়া।" বিসমার্ক ছিলেন কাভুরের মতই বাস্তববাদী, কূটনীতিজ্ঞ। কিন্তু বিসমার্ক কাভুরের মত গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না। কাভুরের পরামর্শে পিড্‌মন্টের রাজা ইতালীর জননায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিসমার্কের পরামর্শে প্রাশিয়ার রাজা সামরিক বলে জার্মানীর ঐক্যসাধনে অগ্রসর হইলেন। আইনসভার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তিনি সেনা-সংগঠনের জন্য কর উঠাইতে লাগিলেন। সুদক্ষ সেনাপতি মল্টকে সামরিক



বিসমার্ক

শিক্ষা ও রণসম্ভার দিয়া প্রাশিয়ান বাহিনী পুনর্গঠন করিলেন। বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইবার অজুহাত খুঁজিতে লাগিলেন।

জার্মানী ও ডেনমার্কের মাঝখানে ছিল শ্লেস্‌উইস ও হল্‌স্টাইন নামে দুটি ছোট জার্মান রাজ্য। কিন্তু ইহারা ছিল ডেনমার্কের অধীন। জার্মান জাতীয়তার ধুয়া তুলিয়া বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলাইলেন এবং ডেনমার্ক আক্রমণ করিলেন। ডেনমার্ককে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া প্রাশিয়া রাজ্য দুটি গ্রাস করিতে চাহিল। অস্ট্রিয়া দাবি করিল রাজ্য দুটি স্বাধীন হইয়া জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য হইবে। এ দাবি ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু বিসমার্ক ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেন না। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিল। অস্ট্রিয়ার পক্ষে ছিল দক্ষিণ জার্মানীর রাজন্যবর্গ, প্রাশিয়ার পক্ষে ইতালী। অস্ট্রিয়া পরাজিত হইয়া ইতালীকে ভেনিশিয়া ছাড়িয়া দিল। প্রাশিয়া জার্মানীর কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রাস করিল এবং জার্মানীর বাইশটি রাজ্য লইয়া এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল।

অস্ট্রিয়াকে অবনত করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের দিকে মন দিলেন। ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন অত্যন্ত প্রভুত্বলোভী। মধ্য ইয়োরোপে প্রাশিয়া ফ্রান্সের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে ইহা অসহ্য। ইহার উপর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রচার চালাইয়া বিসমার্ক তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স সামান্য অজুহাতে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দুর্ধর্ষ প্রাশিয়ার বাহিনীর সম্মুখে ফরাসী সেনা তিষ্ঠিতে পারিল না। বিজয়ী প্রাশিয়ানরা আসিয়া প্যারির উপর চড়াও হইল এবং ভার্সাইর রাজপ্রাসাদে বসিয়া ১৮৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারী রাজা উইলিয়মকে জার্মানীর সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল। উত্তর ও

দক্ষিণের সবক'টি রাজ্য লইয়া জার্মান যুক্তরাষ্ট্র পুনর্গঠিত হইল।

এই অবসরে ভিক্টর ইমানুয়েল রোম দখল করিয়া ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ করিলেন। ইয়োরোপের আসরে তুইটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইল।

কালক্রম

জার্মানী		ইতালী
	১৮১৫	ভিয়েনার বন্দোবস্ত
	১৮৩১	তরুণ ইতালীর জন্ম
জনবিপ্লবের ব্যর্থতা	১৮৪৮-৪৯	জনবিপ্লবের ব্যর্থতা
	১৮৫৯	অস্ট্রিয়ার পরাজয়, লম্বার্ডি, মধ্য ইতালী
	১৮৬০	সিসিলি ও নেপ্‌ল্‌স
	১৮৬১	স্বাধীন ইতালী
বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রী	১৮৬২	
ডেনমার্কের পরাজয়	১৮৬৪	
অস্ট্রিয়ার পরাজয়	১৮৬৬	ভেনিশিয়া
উত্তর জার্মানীর ঐক্য		
ফ্রান্সের পরাজয়	১৮৭০	রোম
জার্মানীর ঐক্য	১৮৭১	

মানুষ বর্বর জীবন হইতে সভ্য জীবনে উন্নত হওয়ার পথে দাসপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্বর যুগে যখন জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধিত তখন বিজেতারা বিজিতদের স্ত্রীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে মারিয়া ফেলিত। ক্রমে মানুষ যখন চাষ-আবাদ ও পশুপালন শিখিল তখন দেখিল যে বন্দী শত্রুকে হত্যা না করিয়া ক্ষেতখামারে কিংবা গোয়ালঘরে কাজে লাগাইলে ভাল হয়। সেই হইতে বন্দী শত্রু গৃহপালিত পশুর মত প্রভুর সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। পশুর মত দাসদেরও বাজারে কেনাবেচা চলিত। মিশর, মেসোপোটামিয়া, ভারত, চীন, গ্রীস, রোম কোন সভ্য দেশে দাসপ্রথার ব্যতিক্রম হয় নাই। রোম সাম্রাজ্যে এই প্রথা অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বড়লোকেরা খামারে, বাগানে, খনিতে, জাহাজে দাসদিগকে নির্মমভাবে খাটাইত, রোমের নাগরিকরা তাহাদিগকে ক্রীড়ামঞ্চে বন্যপশুর সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া তামাশা দেখিত।

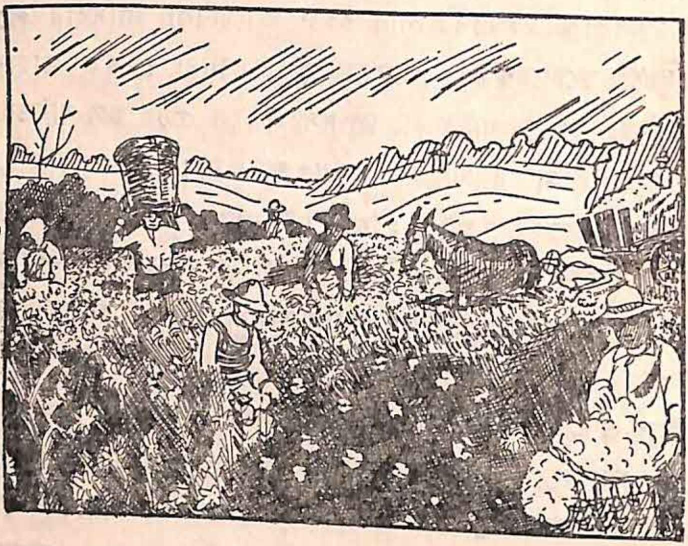
ইয়োরোপে দাসপ্রথা ঃ রোমসাম্রাজ্যের পতনের পর ইয়োরোপ হইতে দাসপ্রথা ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। কিন্তু ষোড়শ শতক হইতে আবার দাসপ্রথা ও দাসব্যবসা মাথা তুলিতে লাগিল। তখন ইয়োরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে সমুদ্রযাত্রার হিড়িক লাগিয়াছে। দূর দূর দেশে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলিতে তুলা, চিনি ও তামাকের চাষ বাড়িয়া উঠিতেছে। দাস খাটাইয়া এই আবাদের কাজ চালানো খুব সহজ ও লাভজনক। কারণ ঐ গরম দেশে অল্প মজুরিতে ইয়োরোপের

লোকেরা কাজ করিতে যাইত না। কাজেই বাগানের মালিকদের মধ্যে দাসশ্রমিকদের চাহিদা বাড়িল। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য ইয়োরোপের বণিক ও ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদিগকে ধরিয়া আনিত এবং চড়া দামে বিক্রি করিয়া প্রচুর মুনাফা করিত। আফ্রিকা হইতে অতলান্ত মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকা আসিবার পথে তাহাদিগকে শুয়োরের মত খোঁয়াড়ে পুরিয়া আনা হইত। তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, পিপাসা পাইলে প্রচুর জল পাইতনা, অসুখ হইলে তাহাদের চিকিৎসা ও ওষুধ জুটিত না।

উনিশ শতকের প্রথম হইতে এই নৃশংস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক সাড়া দিয়া উঠিল। সর্বত্র দাসব্যবসা বে-আইনী ঘোষণা করা হইল এবং পরে দাসপ্রথাও তুলিয়া দেওয়া হইল। এই কাজে প্রথম পথ দেখাইল ইংলণ্ড।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার উচ্ছেদ এত সহজে হয় নাই। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া বিভেদ সৃষ্টি হইল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি ছিল শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান। সেখানে উৎপন্ন হইত সুতার ও পশমের কাপড়, জুতা, ময়দা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্পপণ্য। এই সমস্ত জিনিস এবং অন্য দেশের পণ্য লইয়া সেখানকার বণিকরা দেশবিদেশে চালান দিত। মালিক ও বণিকরা কারখানায় কিংবা জাহাজে কাজ করিবার জন্য ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের মত মজুরি দিয়া লোক রাখিত। আর দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। সেখানে উৎপন্ন হইত কাঁচা মাল অথবা খাদ্য শস্য—যেমন তুলা, তামাক, আখ, চাল, গম। দক্ষিণের তুলা উত্তরে যাইত, সেখানকার কারখানায় সুতা ও কাপড় উৎপন্ন হইয়া বাজারে বাহির হইত। চাষবাসে শিল্পবাণিজ্যের মত লাভ নাই। তার উপর

দক্ষিণ দেশ ছিল গরম। কাজেই এখানে মজুর পাওয়া যাইত না। উপনিবেশ স্থাপনের শুরু হইতেই এখানে দাসপ্রথা চলিয়া আসিতেছিল। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণে দুই দল দাঁড়াইয়া গেল। উত্তরবাসীরা দাসপ্রথার বিরোধী, দক্ষিণবাসীরা দাসপ্রথার সমর্থক।



যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে দাসরা তুলার ক্ষেতে কাজ করিতেছে

ক্রমে এই বিরোধ উগ্র হইয়া উঠিল। দুই দলই পশ্চিম দিকে পতিত জমি উদ্ধার করিয়া উপনিবেশ বাড়াইতে লাগিল। নূতন উপনিবেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হইল। দুই পক্ষই চাহিল নূতন উপনিবেশগুলিতে নিজের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া দল ভারি করিতে। এইরূপে নূতন উপনিবেশগুলিতে মজুরপ্রথা বহাল হইবে না দাসপ্রথা চলন হইবে এই লইয়া উত্তরবাসী ও দক্ষিণবাসীদের মধ্যে বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল।

১৮৬০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া দুই দল সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। উত্তর রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে দাঁড়াইলেন এব্রাহাম

লিংকল্ন। দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে দাঁড়াইলেন স্টিফেন ডগ্‌লাস। লিংকল্ন্ জয়ী হইলেন। দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির ভয় হইল যে এইবার দাসপ্রথা বাতিল হইবে। তাহারা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল এবং একটি পাল্‌টা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল।



এব্রাহাম লিংকল্ন্

গৃহযুদ্ধ ও লিংকল্ন্ঃ তারপর শুরু হইল যুদ্ধ। ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ চলিল। ১৮৬৩ সালে রাষ্ট্রপতি লিংকল্ন্ এক ঘোষণা দ্বারা দাসপ্রথা রদ করিয়া দিলেন। ইহার ফলে বহু নিগ্রো দাস দক্ষিণ দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীতে যোগ দিল। ইহা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা সহজে দমিল না। দুই পক্ষের বহু লোক মরিল, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইল, জনসাধারণের দুর্দশার সীমা রহিল না। হতাশ হইয়া অনেকেই আপসের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকের নিরাশা ও দুর্গতির মধ্যে অটল ও স্থির রহিলেন একা লিংকল্ন। দুইটি বিষয়ে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল ইস্পাতের মত কঠিন। প্রথম, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অব্যাহত রাখিতে হইবে; দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি প্রজাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া মানুষের মর্যাদা দিতে হইবে।

তাঁহার ধৈর্য ও পরিশ্রমের জয় হইল। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য আবার ফিরিয়া আসিল, দাসরা মুক্তি পাইল এবং ক্রমশঃ নাগরিক অধিকার লাভ করিল। পরাজয়ের লজ্জা দূর করিবার জন্য লিংকল্ন্ বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে

পুনরায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করিলেন। ঠিক এই সময়ে এক গুপ্ত শত্রুর হাতে এই মহানুভব দেশনায়কের মৃত্যু হইল।

লিংকল্‌ন্‌-এর অকালমৃত্যুর ফলে আমেরিকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইল না। দাসপ্রথার উচ্ছেদ হইল বটে কিন্তু রহিয়া গেল তীব্র বর্ণবিদ্বেষ। দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলিতে শ্বেতকায় ইয়োরোপীয়রা কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। 'কু ক্লু্‌ ক্স্‌ ক্ল্যান্‌' নামে এক গুপ্ত-সমিতি আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িল। ইহারা নিগ্রোদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করিত এবং সামান্য অথবা বিনা অপরাধে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। অবশ্য এই সমিতি এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের মধ্যে বৈষম্য একেবারে দূর হয় নাই এবং এখনও আমেরিকার কোথাও কোথাও প্রবল বর্ণবিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে ইয়োরোপে এক দিকে দেখা যায় জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, অন্যদিকে দেখা যায় জাতীয় উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস। ইরোরোপ যেন নিজের সীমানা ছাড়াইয়া বিশ্বময় বিস্তারিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ষোড়শ শতকে যখন সামুদ্রিক অভিযানের হুজুগ আরম্ভ হয় তখন হইতে অবিরাম এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া শ্বেতজাতিরা উপনিবেশ স্থাপন করিল। উনিশ শতকে এই তিনমহাদেশ ইয়োরোপের শাখায় পরিণত হইল। এশিয়ায় ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও রাশিয়ানদের সাম্রাজ্য বাড়িতে বাড়িতে প্রায় গোটা মহাদেশ ছাইয়া ফেলিল। শেষে আফ্রিকাও পড়িল ইয়োরোপের কবলে। সারা পৃথিবী ইয়োরোপের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণ : ইয়োরোপের এই চঞ্চলতার মূলে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ইয়োরোপের জনসংখ্যা বাড়িয়াছিল দ্বিগুণেরও বেশী। স্বদেশে অন্ন-সংস্থান করিতে না পারিয়া স্বভাবতঃ অনেকে ভিন্ন দেশে ভাগ্য অন্বেষণ করিতে যাইত। দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হইত। বণিকেরা কারখানার জন্য কাঁচামাল ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার খুঁজিতে দেশবিদেশে কুঠি ও বন্দর স্থাপন করিয়া বসিত। তৃতীয়তঃ রেলগাড়ি, বাষ্পজাহাজ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ায় দেশবিদেশে যাতায়াত ও আদানপ্রদান সহজ হইয়াছিল। বিজ্ঞান

যেন পৃথিবীটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ছোট করিয়া ফেলিল। আর এই বিজ্ঞানের অধিকারী ছিল ইয়োরোপ।

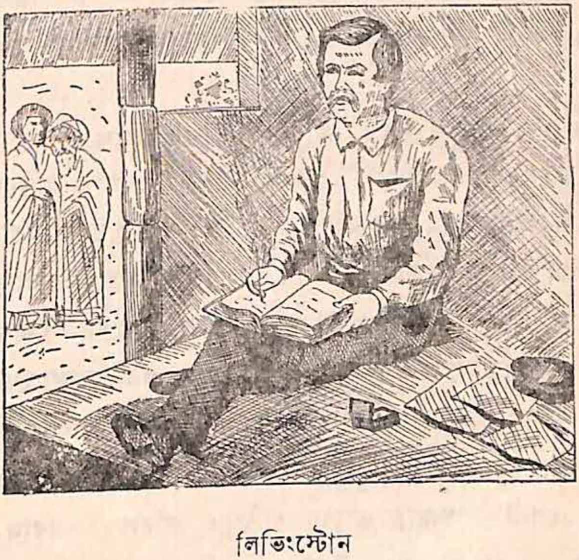
এই সমস্ত কারণে পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির মধ্যে উপনিবেশ লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। যেখানেই কোন দুর্বল অথবা আদিম জাতির অধিবাস সেখানেই তাহারা গিয়া হাজির হইল, সে দেশের অধিবাসীদিগকে শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শোষণ কায়েম করিবার জন্য তাহারা সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিল, কিন্তু ভাব দেখাইল যেন অনুন্নত কৃষ্ণ ও পীত জাতিদিগকে উদ্ধার করিতেই তাহারা আসিয়াছে। তাহাদের শোষণ ও অত্যাচার ঢাকা দিবার জন্য তাহারা একটি মনভুলানো মিষ্টি কথা বাহির করিল,—"শ্বেতজাতির দায়িত্ব"। অর্থাৎ ইয়োরোপীয়রা অন্যান্য মহাদেশে সভ্যতার আশীর্বাদ আনিয়া তাহাদের মহান কর্তব্য পালন করিতেছে।

আফ্রিকা: ইয়োরোপের লোকেরা আফ্রিকাকে বলিত 'অন্ধকার মহাদেশ'। কারণ আফ্রিকার উত্তর উপকূল ছাড়া আর কোন অংশের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই উত্তর উপকূল ছিল তুর্ক সাম্রাজ্যের অধীন। পশ্চিম উপকূলে ছিল বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির ছোট ছোট বাণিজ্যকুঠি, দক্ষিণে ছিল ইংরাজ উপনিবেশ। আফ্রিকার অন্তর্দেশ ছিল অজ্ঞাত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কৌতূহলী পর্যটকরা আফ্রিকার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় সমস্ত মহাদেশের আকৃতি ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কৃত হইল।

এই পর্যটকদের মধ্যে দুইজনের কীর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের নাম ডেভিড লিভিংস্টোন ও স্টান্‌লে।

লিভিংস্টোন ও স্টান্‌লে: ১৮৪০ সালে লিভিংস্টোন আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হন। দক্ষিণ-পূর্বদিকে জাম্বেসি নদীর ধার বরাবর গিয়া

তিনি টাংগানিকা এবং ন্যাস্‌সা হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেন। তারপর বন-জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরত্ব পার হইয়া তিনি মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হন। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের কথা ইয়োরোপে প্রচার হইল। একবার তিনি একটি সুদীর্ঘ পর্যটনে বাহির হইবার পর তাঁহার কোন খবর আসিতেছে না দেখিয়া তাঁহার খোঁজে একটি অভিযান পাঠানো



লিভিংস্টোন

হইল। ইহার পরিচালনা করেন হেনরী স্টান্‌লে। অনেক সন্ধানের পর লিভিংস্টোনকে পাওয়া গেল। এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া ইয়োরোপের লোকদের মনে আফ্রিকা সম্বন্ধে অফুরন্ত আগ্রহ জন্মিল। ১৮৭৩ সালে তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁহার শবদেহ মহাসমারোহে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হইল।

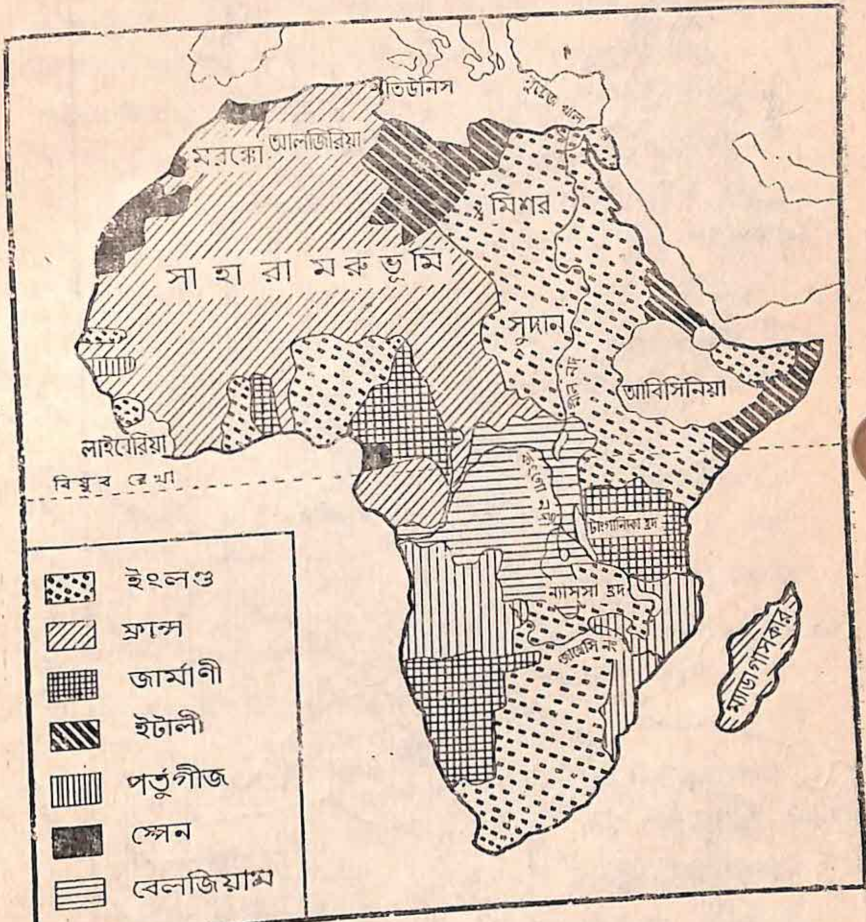
ইহার পর পাঁচ বছর ধরিয়া স্টান্‌লে বিষুবরেখা বরাবর

হ্রদগুলির আশেপাশে ঘুরিয়া অনেক নূতন খবর আনিলেন। তাঁহার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কংগো নদী। এতদিন নদীর মোহনাটুকু ছাড়া আর কিছু ইয়োরোপীয়রা জানিত না। স্টান্‌লের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে একটি, এবং কংগো ও তাহার উপনদীগুলি মিলিয়া সমস্ত মধ্য আফ্রিকা সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

পর্যটকদের পিছনে পিছনে আসিল বৈজ্ঞানিক ও মিশনারী। আফ্রিকার হ্রদ নদী মরুভূমি অরণ্য কোন কিছুর অবস্থান জানিতে বাকি রহিল না।

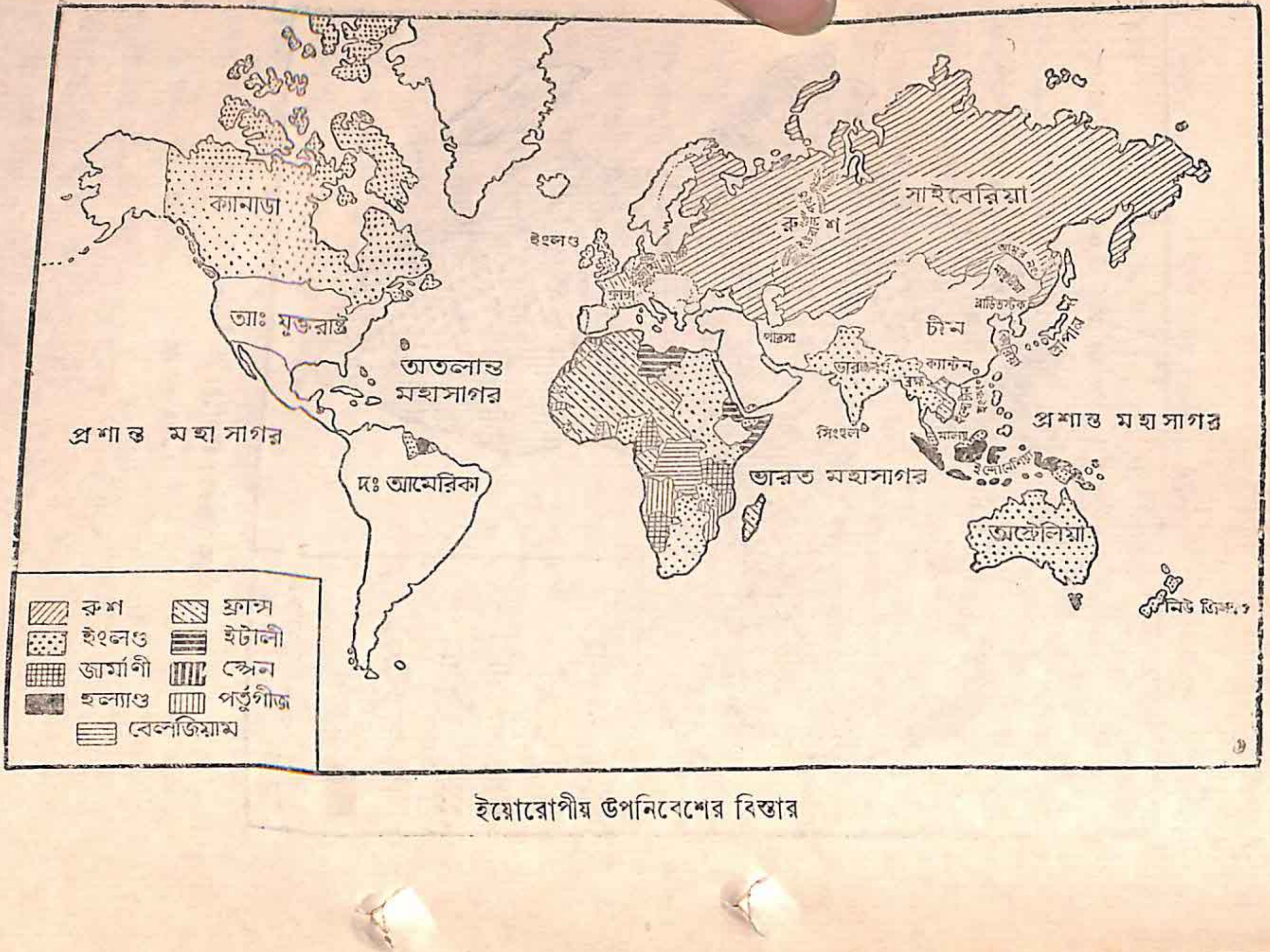
এবার দেশ দখলের পালা। আফ্রিকার উত্তর অংশে তুর্ক-সাম্রাজ্য। তখন সুলতানের আর আগের প্রতাপ নাই। সুযোগ বুঝিয়া ফ্রান্স আলজিরিয়া অধিকার করিয়া বসিল। ১৮৮১ সালে ফ্রান্স ইহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইল তিউনিস অঞ্চল, এককালে যেখানে ছিল রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ। ইতোমধ্যে ইংরাজরা মিশরে কায়েম হইয়া বসিল। মিশরের পূর্বদিকে সুয়েজখাল দিয়া গিয়াছে ভারত সাম্রাজ্যের পথ। এই পথ আগলাইয়া বসিবার মতলব করিয়া ইংলণ্ড মিশরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল এবং শেষে ১৮৮২ সালে মিশরকে একটি তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করিল। এখান হইতে ইংরাজদের ক্ষমতা নীলনদ ধরিয়া দক্ষিণদিকে সুদান রাজ্যে বিস্তৃত হইল। ১৯১৫ সালে সমস্ত নীল উপত্যকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কার্যকলাপ দেখিয়া ইয়োরোপীয় জাতি আফ্রিকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু তার পূর্বেই ইহার মোটা অংশ দখল হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের সাম্রাজ্য আলজিরিয়া, তিউনিস, মরক্কো ও সাহারা লইয়া সমস্ত উত্তর পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে বিস্তৃত



আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় উপনিবেশ

১৮৮৪—১৯০০



ইয়োরোপীয় উপনিবেশের বিস্তার

হইল। দক্ষিণদিকে ইংলণ্ড অন্তরীপের উপনিবেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্রায় সমস্ত দক্ষিণ দেশ জয় করিয়া লইল। ফ্রান্স ইংলণ্ড ও অন্যান্য দাবিদারদের মধ্যে আপসে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া ১৮৮৪-৯০ সালের মধ্যে কতকগুলি চুক্তি হইল। জার্মানী পাইল পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব তীরের বহু ভাল ভাল অঞ্চল। বেলজিয়াম পাইল মধ্য আফ্রিকার কংগো উপত্যকা। ইতালী, স্পেন ও পর্তুগালের ভাগেও কিছু কিছু পড়িল। আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া ভিন্ন আফ্রিকার কোথাও স্বাধীন নিগ্রো বসতির চিহ্ন রহিল না।

এশিয়া ঃ আফ্রিকা ভাগাভাগি করিবার বহু পূর্বে ইয়োরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিল। এখন বাকি অংশগুলির উপর তাহাদের নজর পড়িল।

এশিয়ায় সকলের আগে জাঁকিয়া বসিল রুশ। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা আসিবার বহু আগে রুশ সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া জয় করিয়া লয়। সাইবেরিয়ার দিগন্তবিস্তৃত প্রান্ত ছিল অপরাধীদের নির্বাসনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। উনিশ শতকের আরম্ভে উরাল পর্বত হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। তখনও সম্রাট্ ও রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি ছিল ইয়োরোপের উপর। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে তখন তুর্কসাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইতেছে। রুশ চেষ্টা করিল সেদিক দিয়া ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আসিয়া বাধা দিল। তখন রুশ আবার এশিয়ার দিকে নজর ফিরাইল। মধ্য এশিয়া হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া রুশ সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। আর পূর্ব দিকে চীনের হাত হইতে আমুর নদীর উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়া ভ্লাডিভস্টকে সে এক নৌঘাটি নির্মাণ করিল। বল্টিক হইতে জাপান সাগর পর্যন্ত এশিয়া ও

ইয়োরোপের অর্ধেক ভূখণ্ডে রুশ সম্রাটের পতাকা উড়িল। এত বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয় নাই।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম ও মালয় জুড়িয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী ও ওলন্দাজরা সরিয়া গেল পূর্বদিকে। ফরাসীরাও বসিল ইন্দোচীনে, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে। ইহার উত্তরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছিল স্পেনের হাতে ১৮৯৮ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে পরাজিত করিয়া এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিল। দূর প্রাচ্যে এক নূতন ঔপনিবেশিক শক্তির আবির্ভাব হইল।

বাকি রহিল প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি। এগুলি ভাগ-বাটোয়ারা হইল ইংলণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি শান্তিপ্রিয় মহাচীন ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যক্ষুধার কবলে পড়িল। উত্তর হইতে রুশ ও দক্ষিণ হইতে ফ্রান্স আসিয়া আবার অঙ্গচ্ছেদ করিল। সমুদ্রতীর হইতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশ, জার্মানী ও জাপান আসিয়া বন্দরে বন্দরে ঘাটি বসাইল এবং উপকূলের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি শোষণ করিবার জন্য যার যার এলাকা ভাগ করিয়া লইল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম: এই প্রকারে একে একে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ ও জাতি শ্বেতজাতির পদানত হইল। এই বিশ্বগ্রাসী উদ্যোগের পিছনে অনেক পাপ ও অন্যায় আসিয়া জমিল। সাম্রাজ্যবাদীরা সঙ্গে আনিল লোভ, ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব। জার্মানী ইতালী ও জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়িয়া গুমরাইতে লাগিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে ব্যস্ত হইল। এতদিন ছিল ইয়োরোপের ভূমি লইয়া বিবাদ। এবার দ্বন্দ্ব বাধিল পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য লইয়া। সাম্রাজ্য-

বাদীদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার পরিণাম হইল পর পর দু'টি সর্বনাশা মহাযুদ্ধ।

এদিকে সাম্রাজ্যের শোষণ ও শাসনের পীড়নে আত্মবিস্মৃত প্রাচ্য দেশগুলিতে চেতনার সঞ্চার হইল। উনিশ শতকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইয়োরোপের জাতিগুলি অনেক স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়াছে, অনেক সাম্রাজ্যের দম্ভ চূর্ণ করিয়াছে। এশিয়া ইয়োরোপের কাছে সেই জাতীয়তার মন্ত্র গ্রহণ করিল। বিশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার ইতিহাস জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাস, সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস।

চীন ও জাপানের বর্তমান ইতিহাসে অনেক বিষয়ে যেমন সাদৃশ আছে অনেক বিষয়ে তেমন পার্থক্যও আছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই দুই দেশ ছিল বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন। তারপর চীনের দুয়ারে আসিয়া হানা দিল ইংলণ্ড, জাপানের দুয়ারে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। ইহাদের পিছনে পিছনে আসিল আর আর পাশ্চাত্ত্য জাতি। তাহাদের আঘাতে একই সময়ে এবং একই প্রকারে চীন ও জাপানীদের বন্ধ দরজা ভাঙিয়া গেল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া চীন ও জাপানের উপর এক রকম হইল না। তাহাদের জীবনের ধারা দুই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল।

চীন : উত্তরে রুশ ও দক্ষিণে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত মহাচীন এক অতি প্রাচীন সভ্য দেশ এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল। চীনজাতি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। বাহির বিশ্বের সঙ্গে তাহারা কোন সম্পর্ক রাখিত না। শুধু ক্যাণ্টন বন্দরে বিদেশীরা আসিয়া কিছু কিছু বাণিজ্য করিতে পারিত। চীনজাতির একমাত্র কাম্য ছিল নিজেদের ধর্ম ও আচার-বিচার লইয়া নিজেদের দেশে শান্তিতে বাস করা।

কিন্তু তা হইবার নয়। ইয়োরোপীয়রা বাণিজ্যের পসরা ও যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া আসিল, চীনের ভূমির উপর জমিদারী স্বত্ব ও বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করিল এবং চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। ইংরাজ বণিক সঙ্গে আনিল আফিম। আফিমের নেশা জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, তাই চীন চাহিল ইহার আমদানী

বন্ধ করিতে। কিন্তু ইংরাজ বণিক মুনাফা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে জোর করিয়া আফিমের ব্যবসা চালাইল। চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল মাঞ্চু রাজবংশ। নিরুপায় হইয়া মাঞ্চুরাজা যুদ্ধে নামিলেন। দুই বছর লড়াই করিয়া তিনি পরাস্ত হইলেন। ১৮৪২ সালে নানকিং-এর সন্ধিতে চীন হংকং দ্বীপ ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিল, বহু অর্থ দিল এবং ক্যান্টন ছাড়া আরও চারটি বন্দরে ইংরাজদিগকে বাণিজ্যের সুবিধা দিল। এই পাঁচটি খোলা বন্দর হইল চীনের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করিবার পথ। ইংলণ্ডের দেখাদেখি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করিল। একে একে ইয়োরোপীয় জাতিগুলি আসিয়া পাঁচটি খোলা বন্দরে কুঠি করিয়া বসিল। চীন ও পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের মধ্যে দূত বিনিময় হইল।

পাশ্চাত্ত্য শক্তি ও জাপানের আগমন : শুধু বাণিজ্যের সুবিধা নয়, ইয়োরোপীয়রা চীনের নিকট হইতে স্বতন্ত্র নাগরিক অধিকার আদায় করিয়া লইল। স্থির হইল চীন সরকারের আইন ও শাসন বিদেশীদের উপর খাটিবে না, চীনে বাস করিয়াও তাহারা মাতৃভূমির শাসনের আওতায় থাকিবে।

ইতিমধ্যে জাপান আসিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে জুটিল। চীনের শোষণে সেও ভাগ বসাইল। তাহার লোভ অন্যের চেয়ে বেশী। উভয়ের মাঝখানে চীনের করদরাজ্য কোরিয়া। ১৮৯৪ সালে জাপানীরা এখানে হানা দিয়া চীনদিগকে তাড়াইয়া দিল, এখান হইতে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিয়া দুর্ভেদ্য পোর্ট আর্থার দুর্গ ও লিয়াও-তুং উপদ্বীপ অধিকার করিল। রাজধানী পিকিং বিপন্ন দেখিয়া চীন সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১৮৯৫ সালে শিমোনোসেকির সন্ধিতে চীন কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা মানিয়া লইল।

জাপানকে প্রচুর খেসারত দিয়া পোর্ট আর্থার, লিয়াও-তুং উপদ্বীপ ও ফরমোসা দ্বীপ ছাড়িয়া দিল।

এমন সময়ে রুশ, ফ্রান্স ও জার্মানী আসিয়া জাপানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল। তাহারা ধুয়া তুলিল জাপানের বেয়াদবি চীনের স্বাধীনতা ও প্রাচ্যের শান্তি বিপন্ন করিয়াছে। চীনকে তাহার ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। জাপান ভয়ে ভয়ে লিয়াও-তুং ও পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া দিল। তিন বছরের মধ্যে চীনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অভিসন্ধি প্রকাশ পাইল। ১৮৯৮ সালে দুইজন মিশনারী নিহত হইলে সেই অজুহাত দেখাইয়া জার্মানী কিয়াউ চাউ নামক একটি পোতাশ্রয় দখল করিল, ইহার চারিপাশের অঞ্চলে বাণিজ্যের এবং শুল্ক ও খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করিল। শান-তুং প্রদেশ জার্মানীর 'প্রভুত্ব এলাকা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে রুশ পঁচিশ বছরের লীজ লইয়া, পোর্ট আর্থার দুর্গে ঘাটি করিল। দেখাদেখি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড লীজ নেওয়ার ছল করিয়া এক একটি বন্দর দখল করিয়া বসিল। তাহাদের সকলের চাপে পড়িয়া চীন বারটি বন্দর বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিল এবং বিদেশীদিগকে কারখানা, খনির কাজ ও রেলপথ খুলিবার অবাধ অধিকার প্রদান করিল। মনে হইল বুঝিবা পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকার মত চীনকেও ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবে।

বকসার বিদ্রোহ : এমন সময়ে ১৯০০ সালে নিপীড়িত শোষিত জনতার বিক্ষোভ বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িল। উত্তর চীন জুড়িয়া আওয়াজ উঠিল বিদেশী দানবদিগকে সমুদ্রে ফেলিয়া দাও। ক্ষুব্ধ জনতা বহু মিশনারী ও খ্রীষ্টানকে হত্যা করিয়া অবশেষে পিকিং এর বিদেশী দূতাবাসগুলি ঘেরাও করিল। বিপদে পড়িয়া বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল। তাহারা এক

আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করিয়া চীনে পাঠাইল। এই বিদ্রোহের প্রচণ্ড মুষ্টির আঘাতে বিদেশী শক্তি টলমল করিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বিদেশীরা ইহাকে বলিত 'বক্সার' বিদ্রোহ। আন্তর্জাতিক অভিযান আসিয়া দূতাবাসগুলি মুক্ত করিল, বিদ্রোহ দমন করিল।

এবার চীন রাষ্ট্রীয় মহলের চৈতন্য হইল। রাষ্ট্রনেতারা বুঝিলেন যে চীনকে বাঁচাইতে হইলে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে। তাঁহারা ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে চীনসেনা পুনর্গঠন করিবার জন্য জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। স্কুলে কলেজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন হইল। আফিম খাওয়া নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কার দ্রুত কার্যকরী করিবার শক্তি পিকিং-এর রাজদরবারের ছিল না। বহুকাল ধরিয়া মাঞ্চু রাজবংশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে দক্ষিণ ও মধ্য চীনে এক বিরাট প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা দিল। ১৯১১ সালে নান্কিংকে রাজধান ও সান্ ইয়াৎ-সেনকে রাষ্ট্রপতি করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। পরের বছর নান্কিং ও পিকিং শহরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। মাঞ্চুরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। চীন সাম্রাজ্যের অবসান হইল। উয়ান শি-কাই চীন গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।


ডাক্তার সান্ ইয়াৎ-সেন

গৃহযুদ্ধ: কিন্তু চীনের সমস্যা মিটিল না, বরং দিন দিন জটিল হইতে লাগিল। সান ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার প্রগতিশীল দল

রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া মস্ত ভুল করিলেন। চীনে নিঃস্বার্থ দল ও জননায়কের একান্ত অভাব দেখা গেল। জনগণের যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ছিল না। সুতরাং প্রজাতন্ত্রের নামে চলিল সর্দারদের দলাদলি ও ক্ষমতা লইয়া মারামারি। এদিকে উত্তর দিকে জাপান আসিয়া হানা দিয়াছে আর বিদেশীরা শোষণের জাল বিস্তার করিতেছে। তখন সান্ ইয়াৎ-সেন বিপ্লবীদিগকে লইয়া কোমিণ্টাং দল গঠন করিলেন। এবং অকর্মণ্য পিকিং সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাণ্টনে এক পাল্‌টা সরকার স্থাপন করিলেন। চীন আবার উত্তর ও দক্ষিণ দুই রাষ্ট্রে ভাগ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এক বিশ্বব্যাপী মহাসমরে মাতিয়া উঠিল। ইহার একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকান যুক্ত-রাষ্ট্র অন্যদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। প্রথম পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া এবং বিদেশী শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় পিকিং সরকার তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে নামিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তিবৈঠকে চীনের কোন দাবীকে আমল দেওয়া হইল না।

সান্ ইয়াৎ-সেনের ত্রি-নীতি : ১৯২৫ সালে যখন চীনের ক্ষমতা-লোভী জঙ্গী সর্দারদের গৃহযুদ্ধ চরমে উঠিয়াছে তখন সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর আগে তিনি একটি পুস্তকে তাঁহার আদর্শ ও কর্মপন্থা লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। ইহার নাম 'সান-মিন-চু-ই' বা 'জনগণের ত্রি-নীতি'। সান্ বলিয়া গেলেন তিনটি নীতি অবলম্বন করিয়া চীনকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। প্রথম, জাতীয়তা। চীনজাতি এক অবিভাজ্য জাতি এই চেতনা সকলের মধ্যে আনিতে হইবে। এবং জাতিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামাইতে হইবে দ্বিতীয়, গণতন্ত্র। স্বাধীন চীনের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে চীন জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। কিন্তু যতদিন

সারা চীনের ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জিত না হইবে ততদিন কোমিণ্টাং দলের একনায়কত্ব মানিয়া চলিতে হইবে। তৃতীয়, শোষণমুক্তি। জনতাকে শোষণ ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিতে হইবে। চাষী মজুররা খাটিয়া মরিবে আর জমিদার, মালিক ও বিদেশী বণিক মোটা মুনাফা লুটিবে এই বৈষম্য চলিবে না।

সানের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কোমিণ্টাং দল নবজীবন লাভ করিল। রুশদেশে তখন কম্যুনিস্ট নামে এক সাম্যবাদী দল রাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রভার গ্রহণ করিয়াছে। চীনদেশেও কম্যুনিস্ট দলের এক শাখা ছিল। চীন কম্যুনিস্টরা আসিয়া কোমিণ্টাং দলে যোগ দিল। রুশ হইতে কম্যুনিস্ট বিশেষজ্ঞরা আসিয়া কোমিণ্টাং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিল, জাতীয় বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দিল। চিয়াং কাই-শেক নামে এক তরুণ সেনাধ্যক্ষ কোমিণ্টাং ও জাতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব লইলেন। ১৯২৬ সালে দ্বিতীয় মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বছর না ঘুরিতে স্বার্থপর জঙ্গী সর্দাররা তাহাদের ঘাঁটি হইতে বিতাড়িত হইলেন, বিদেশীরা কুঠি ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। নান্‌কিং-এ চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২৮ সালে নান্‌কিং সরকার পিকিং অধিকার করিয়া মহাচীনের স্বাধীনতা ও ঐক্য ফিরাইয়া আনিলেন।



চিয়াং কাই-শেক

গৃহবিবাদ ও জাপান : এত করিয়াও চীনের কপালে শান্তি জুটিল না। এই মহান সাফল্যের পরিসমাপ্তি হইল আত্মঘাতী গৃহবিবাদে। কোমিণ্টাং ও কম্যুনিস্ট দলের আদর্শ এক ছিল না। কম্যুনিস্টরা চাহিল রুশের অনুকরণে বিপ্লব আনিয়া রুশের তাঁবেদার সরকার গঠন করিতে। কোমিণ্টাং দল চাহিল দলীয় প্রভুত্ব ও জাতীয় সরকার গঠন করিতে। তাহারা কম্যুনিস্টদিগকে তাড়াইতে ও হত্যা করিতে লাগিল। জাতীয় শক্তি দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল ও চীনবাসীরা এক অন্তহীন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইল।

চীনের শত্রু জাপান এতদিন ধরিয়া এই সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। ১৯৩১ সালে জাপানী সৈন্য ঝড়ের বেগে মাঞ্চুরিয়ার উপর আসিয়া পড়িল। চীনের উত্তরপূর্ব সীমানায় এই দেশ বাণিজ্যে ও শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ। চীন হইতে ইহা ছিনাইয়া লইয়া জাপানীরা এখানে মাঞ্চুকো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র খাড়া করিল। সেখান হইতে সমুদ্রের তীর বরাবর তাহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। নান্‌কিং সরকার ইহার কাছে বারবার আবেদন করিয়াও সাড়া পাইলেন না। সর্বনাশের সম্মুখীন হইয়া কোমিণ্টাং ও কম্যুনিস্ট দল তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিল। ১৯৩৭ সালে চীন এক হইয়া যুদ্ধে নামিল। জাপানের আক্রমণে চীনে অভূতপূর্ব দেশপ্রেম ও ঐক্যচেতনার সঞ্চার হইল।

জাপান : চীন ও রুশের পূর্বদিকে অর্ধচন্দ্রের মত সজ্জিত গুটিকয়েক দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত। রুক্ষ পর্বতময় দেশ, চাষ হয়

অল্প, অথচ জনসংখ্যা প্রচুর। চালের অভাব পূরণ করিতে হয় মাছ দিয়া। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গার ও ভূমিকম্প মাঝে মাঝে প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া বসে। এজাতি স্বভাবতঃই সাহসী, পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল। প্রতিবেশীদের উর্বর ধনসমৃদ্ধ ভূমিতে যে ইহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি?

কিন্তু জাপান প্রথমে লোভাতুর ছিল না। সে ছিল চীনের মতই শান্তিপ্রিয়, ঘরমুখী। তার সভ্যতা চীনের কাছেই শেখা। তথাপি চীন সভ্যতা হইতে জাপানী সভ্যতা ছিল স্বতন্ত্র। চীনের মত জাপানেও ছিল রাজতন্ত্র ও সামন্তপ্রথা, কিন্তু রাজা ও সামন্তদের সম্মান ছিল অনেক বেশী। সামন্তদের নীচে ছিল যোদ্ধারা। তাহাদিগকে বলিত সামুরাই। দেশের ধর্ম ছিল শিন্টো। শিন্টোধর্মের একটি প্রধান উপদেশ—'দেবতাদিগকে ভক্তি করিবে ও দেশকে ভালবাসিবে।' দেশপ্রেম জাপানীদের শুধু ধর্ম বা কর্তব্য নয়। ইহা আমাদের স্বভাব, তাহাদের রক্তে মেশানো। সাহস, আত্মদান, আনুগত্য ইত্যাদি সেনাধর্মেরও খুব সমাদর ছিল। শিল্পেও ছিল ইহাদের অসাধারণ প্রতিভা এবং ইহারা অপরের সদ্‌গুণ অতি সহজে গ্রহণ করিতে পারিত।



জাপানের সামুরাই

কমোডোর পেরী : বাহিরের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল ইহাদের নামমাত্র। একটি মাত্র বন্দরের মারফত ওলন্দাজদের সঙ্গে কিছু কিছু বাণিজ্য চলিত। এমন সময় কমোডোর পেরীর নেতৃত্বে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের এক নৌবাহিনী জাপানের দুয়ারে আসিয়া হাজির হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি শিকার করিতে গিয়া আমেরিকান নাবিকদের কখনো কখনো জাহাজ ডুবি হইত। জাপানের তীরদেশে গিয়া পড়িলে যেন তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং জাপানী বন্দরে যেন আমেরিকান জাহাজ ভিড়াইতে দেওয়া হয়, ইহাই হইল পেরীর দাবি। দাবির পিছনে নৌবহর ও কামানবন্দুক দেখিয়া জাপানী সরকার ইহার গুরুত্ব বুঝিয়া লইলেন। ১৮৫৪ সালে এক চুক্তি দ্বারা দুইটি বন্দর আমেরিকান জাহাজের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর আসিল অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি। ক্রমে ক্রমে সকলেই অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আদায় করিয়া লইল।

জাপানের সামনে এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিল। সে কি পাশ্চাত্ত্য জাতিদের শোষণের রসদ যোগাইবে, না তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইবে? তাড়াইতে হইলে সে শক্তি তাহার কোথায়? তাড়াইবার একমাত্র উপায় আছে—সে হইল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা আয়ত্ত করা। তাহা করিতে হইলে নিজেদের ধর্মকর্ম আচার ঐতিহ্য আমূল সংস্কার করিতে হয়। অনেক মতভেদ ও বিবাদের পর জাপান তাহাই স্থির করিল। ১৮৬৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ বছরের মধ্যে জাপান তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো একেবারে বদলাইয়া ফেলিল। যে জাতি শত শত বছর ধরিয়া সব রকম বিদেশী প্রভাব বর্জন করিয়া আসিয়াছে সে জাতি এই অল্প সময়ে এমন করিয়া বিজাতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিল যে জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ড বা আমেরিকার কোন প্রভেদ রহিল না।

জাপানের পরিবর্তন : সেনাবিভাগ জার্মান ছাঁচে ঢালিয়া সাজান হইল। ইহা আর সামুরাইদের বা সামন্তসেনার হাতে রহিল না। ১৮৭২ সালে সামরিক শিক্ষা ও কাজ হইল প্রত্যেক যুবকের পক্ষে বাধ্যতামূলক, যন্ত্রশিল্প আমদানি করিয়া উৎপাদন বাড়ানো হইল,

জাহাজের ও অস্ত্রের কারখানা বসিল। হাজার মাইল জুড়িয়া রেলপথ পড়িল। সাধারণ ও কারিগরি স্কুল খোলা হইল অজস্র। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য টোকিও ও কিওটোতে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পড়াইবার জন্য বিদেশ হইতে অধ্যাপক আসিলেন। ১৮৭৩ সালে ইয়োরোপীয় ক্যালেণ্ডার গৃহীত হইল। ইয়োরোপের অনুকরণে আইনকানুন সংস্কার করা হইল। ১৮৯০





জাপানের দুই সম্রাট্

প্রাচীন বেশে আধুনিক বেশে

সালে নূতন সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এক আইনসভা গঠিত হইল, কিন্তু সম্রাটের ক্ষমতা বিশেষ কমানো হইল না। জাপানের যাবতীয় সংস্কারের মূলে ছিল সম্রাটের দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্ব। প্রাচীন পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া এবং আধুনিক বেশে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তিনিই প্রথম নূতন যুগের সূচনা করেন।

শিল্পে, বাণিজ্যে ও সেনাদলে জাপান অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

১৯০৫ সালের মধ্যে চীন ও রুশের বিরুদ্ধে দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান তাহার শক্তিমত্তার পরিচয় দিল।

যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার সাথে সাথে জাপান পাশ্চাত্ত্য গুরুর নিকট আর এক বিদ্যা শিখিল, সে হইল সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা। তাহারও শিল্পপণ্যের জন্য কাঁচামাল ও বাজার চাই, বাড়তি জনতার জন্য উপনিবেশ চাই। চোখের সামনে চীনের সম্পদ দূরদেশের লোকেরা আসিয়া লুটিয়া লইতেছে, জাপান এত কাছে থাকিয়া বাদ পড়িবে কেন? প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ লইয়া কোরিয়া উপদ্বীপ চীনের গা হইতে বাহির হইয়া জাপানের দিকে ঝুঁকিয়া আছে যেন তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্যই। তার উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, সেখানে আছে কয়লা ও লোহার খনি, আধুনিক সভ্যতা ও সামরিক শক্তির উপাদান। এই দুই অঞ্চলের উপর জাপানের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ: চীনকে পরাস্ত করিয়া জাপান যখন তাহার শিকার আগলাইয়া বসিয়াছে এমন সময়ে রুশ আসিয়া অনর্থ ঘটাইল। জাপান মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলাইল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রুশকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রুশ চীন সরকারের নিকট হইতে লীজ লইবার নাম করিয়া পোর্ট আর্থারে নৌঘাটি বসাইল। এই বন্দর ও দুর্গটি মাঞ্চুরিয়ার রক্ষী। রুশ ইহাকে রেলপথে সাইবেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করিল, মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করিল। এইরূপে রুশ যখন মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে তখন জাপান পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিল। দুই বছরের মধ্যে রুশ জলে ও স্থলে সর্বত্র পরাজিত হইয়া সন্ধি করিল। ১৯০৫ সালে পোর্টস্‌-মাউথের সন্ধিতে রুশ মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিল এবং পোর্ট আর্থার, লিয়াও-তুং উপদ্বীপ ও সাঘালিন দ্বীপের দক্ষিণ অংশ জাপানের হাতে সমর্পণ করিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার : রুশের মত বিরাট পাশ্চাত্ত্য শক্তিকে এশিয়ার ক্ষুদ্রশক্তি জাপান পরাস্ত করিতে পারে ইহা ছিল ধারণার অতীত। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৯১০ সালে সে কোরিয়া দখল করিল, ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া জার্মানীর হাত হইতে শান-তুং প্রদেশ কাড়িয়া লইল। ফরমোসা, সাঘালিন, কোরিয়া, শান-তুং ও লিয়াও-তুং লইয়া জাপানের সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২১ সালে প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলির দাবী দাওয়ার মীমাংসা করিবার জন্য ওয়াশিংটন শহরে এক শান্তি বৈঠক বসিল। চীনের শাং-তুং প্রদেশ ভিন্ন আর কোন অংশ জাপানের ভাগ্যে জুটিল না। তখন বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের ভয়ে ও চীনে জাতীয় অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া কিছুদিনের মত জাপান নিরস্ত রহিল। তারপর চীনে আরম্ভ হইল কোমিণ্টাং-কম্যুনিস্টের সংঘর্ষ। জাপানে সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গী দল প্রাধান্য লাভ করিল। ১৯৩১ সালে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল। তারপর ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯৪১ সালে জাপান, জার্মানী ও ইটালীর পক্ষ লইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল আর চীন আসিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিবিরে। চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যে চীন জাতীয় শক্তির সন্ধান পাইল। ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি অটল পর্বতের মত জাপানী আক্রমণ রুখিয়া দাঁড়াইল। জাপান তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করিতে পারিল না।

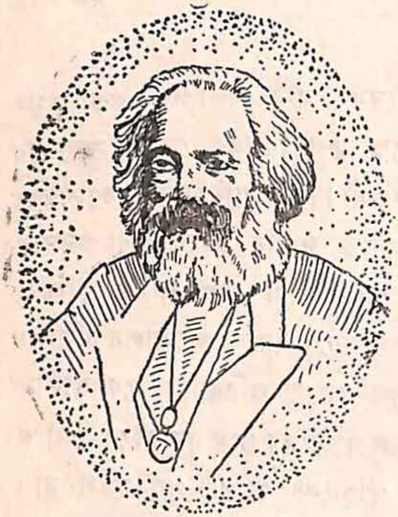
কালক্রম

	চীন	জাপান
১৮৪০-৪২	আফিম যুদ্ধ	
১৮৫৪		কমোডোর পেরীর দৌত্য
১৮৬৮		ইয়োরোপের অনুকরণে জাতীয় সংস্কার
১৮৯৪	চীন-জাপান যুদ্ধ	
১৮৯৫	শিমোনোসেকির সন্ধি	
১৮৯৮	কিয়াউচাউ, শান-তুং, পোর্ট আর্থার	
১৯০০	বক্সার বিদ্রোহ	
১৯০৩-১৯০৫		রুশ-জাপান যুদ্ধ পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি
১৯১০		কোরিয়া অধিকার
১৯১২	মাঞ্চুবংশের পতন	
১৯১৪		শান-তুং অধিকার
১৯১৭	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন	
১৯২১-২২		ওয়াশিংটন বৈঠক
১৯২৬-২৭	জাতীয় বিপ্লব	
১৯৩১	কোমিণ্টাং-কম্যুনিস্ট যুদ্ধ, মাঞ্চুরিয়া অধিকার	
১৯৩৭-১৯৪৫	জাতীয় ঐক্য ও চীন-জাপান যুদ্ধ	

আঠার শতকে ফরাসী বিপ্লব যেমন মানব-সভ্যতায় এক তুমুল পরিবর্তন আনিয়াছিল, বিশ শতকে রুশ বিপ্লবও তেমন সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসী বিপ্লব আনিয়াছিল জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শ। প্রত্যেক জাতি স্বাধীন হইবে এবং জনতার ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করিবে, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশে দেশে আন্দোলন চলিল। ইয়োরোপের সাধারণ দরিদ্র মানুষ আশা করিয়াছিল যে, জাতীয় স্বাধীনতা ও জনরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে তাহাদের দুঃখ দূর হইবে, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য থাকিবে না। তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ত প্রথা ভাঙিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল সরকারী ক্ষমতা ধনীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা সাধারণ লোকের হাতে ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক।

সমাজবাদঃ শিল্পবিপ্লবের পর হইতে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বাড়িতে লাগিল। চাষী ও মজুর পরিশ্রম করিয়া খাদ্য ও পণ্য উৎপাদন করে, আর লাভের মোটা অংশ যায় মালিকের হাতে। এই অবিচার দূর করিতে হইলে কৃষিশিল্পের মালিকানা ও উৎপাদনের দায়িত্ব লইতে হইবে সমস্ত সমাজকে। সমাজ মালিক হইলে দেশের বিত্ত সকলেই ভোগ করিতে পারিবে। এই মতবাদের নাম সমাজবাদ। সমাজবাদের গুরু হইলেন কার্ল মার্কস্ নামে জার্মানীর এক দার্শনিক। তিনি স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া আসিলেন ইংলণ্ডে। এখানে বসিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে আধুনিক যন্ত্র-

সভ্যতাকে চালাইতেছে কারখানার মজুররা। অথচ তাহাদেরই দুর্দশার সীমা নাই। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সর্বহারা মজুররা জাগিয়া উঠিবে এবং ধনতন্ত্র বা মালিক-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র বা সমাজের মালিকানা প্রবর্তন করিবে।


কার্ল মার্কস্

রুশের অবস্থা : মার্কস মনে করিয়াছিলেন যে নিঃস্বরা প্রথম বিপ্লব আনিবে শিল্পপ্রধান দেশে। রুশ ছিল শিল্পে অনগ্রসর। বিশ শতকের আরম্ভেও এখানে সামন্তপ্রথা ও রাজার স্বেচ্ছাচার বলবৎ ছিল। রুশ-সম্রাট্‌রা জার সেনা ও গোয়েন্দার সাহায্যে ইচ্ছামত দেশ শাসন করিতেন। দেশ কৃষিপ্রধান, তবে শিল্পের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মূলধন জোগাইত ও মুনাফা খাইত বিদেশী ব্যাঙ্ক। মজুরদের জীবনযাত্রা ছিল পশুরও অধম।

জারের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সামন্তশ্রেণী ভিন্ন সকল শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। জারতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার জন্য অনেক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হইল। মার্কসের মতে বিশ্বাসী সমাজবাদীদিগকে লইয়া বলশেভিক দল গঠন করিলেন বিপ্লবনায়ক লেনিন। মার্কসের মত তাঁহাকেও দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটাইতে হইয়াছিল। বহু আন্দোলনের পর জার কিছু কিছু সমাজবৈষম্য দূর করিলেন

এবং প্রজাদিগকে সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেন। কিন্তু কোথাও কোন মৌলিক পরিবর্তন হইল না।

সাম্রাজের বিপুল বৈভব ও প্রবল প্রতাপের অন্তরালে জারতন্ত্র ছিল একেবারে অন্তঃসারশূন্য। আঠার শতকের ফ্রান্সের মত এখানেও রাজা ছিলেন দুর্বল ও অকর্মণ্য, অভিজাত ও যাজকদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল না, আর আমলাতন্ত্র সরকারের উপর আস্থা হারাইয়াছিল। ফ্রান্সের মত এখানেও অসম রাজস্বনীতির ও অপব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর অদূরদর্শী শাসকরা রুশকে বিশ্বযুদ্ধে নামাইলেন। রুশ জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের শরিক হইল। দু'তিন বছরের মধ্যে বিশৃঙ্খল রুশসেনা দুর্ধর্ষ জার্মানবাহিনীর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। সৈনিকদের সাজপোশাক, খাদ্য, বেতন, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুতেই ঘাটতি পড়িল। অভুক্ত, পরিশ্রান্ত, লাঞ্ছিত সৈন্যরা আর যুদ্ধ করিতে চাহিল না। কোথাও কোথাও তাহারা বিদ্রোহ করিয়া বসিল। শহরে দেখা দিল দারুণ অন্নাভাব। কারখানার মজুররা রুটির দোকান লুঠ করিতে লাগিল। জমিদারের খাজনা দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হইয়া চাষীরা জমির স্বত্ব দাবি করিল। পেট্রোগ্রাড শহরে মজুররা ধর্মঘট করিল, ক্রমে ধর্মঘট দাঙ্গা ও বিদ্রোহে আসিয়া দাঁড়াইল। সৈনিকদিগকে আনিয়া জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ দেওয়া হইল কিন্তু তাহারা আদেশ পালন করিল না। জনতার আক্রোশ গিয়া পড়িল জারের রক্ষী ও পুলিশদের উপর। দেশের আইনসভা


লেলিন

বা ডুমা শাসনক্ষমতা দখল করিয়া এক অস্থায়ী সরকার স্থাপন করিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিলেন।

এইরূপে ১৯১৭ সালের ১৫ মার্চ রুশ সাম্রাজ্য ও জারতন্ত্রের অবসান হইল। অস্থায়ী সরকার রুশে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিলেন। ইহার কর্ণধার হইলেন প্রিন্স লভ্ নামে একজন অভিজাত শিল্পপতি। পরে কেরেন্সকী নামে এক বিপ্লবী নেতা ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অস্থায়ী সরকার অধীনস্থ জাতিগুলিকে স্বায়ত্বশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তাঁহারা আসল সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না। মজুর চায় রুটি, চাষী চায় জমি, সৈনিক ও সমস্ত জাতি চায় শান্তি। কেরেন্সকী সরকার এর কোনটিই দিতে পারিলেন না।

বলশেভিক বিপ্লব : ইতোমধ্যে গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে মজুর, চাষী ও সৈন্যরা মিলিয়া সোভিয়েত বা পঞ্চায়েত গঠন করিল ও স্থানীয় শাসন করায়ত্ত করিল। বলশেভিক দলের নেতা লেলিন সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসনে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। শহর ও গ্রামের সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক দলই প্রধান। লেলিন গোপনে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনটি দাবীর আওয়াজ তুলিলেন। জমির মালিক হইবে চাষী, কারখানার মালিক হইবে মজুর আর দেশের মালিক হইবে সোভিয়েত। ইহাদের আগে চাই শান্তি ও রুটি। লেলিনের মুখে রুশ জনতার প্রাণের কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে লেলিনের প্রধান সহকারী ট্রট্স্কী নির্বাসন হইতে ফিরিয়া পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বলশেভিক স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া 'লালফৌজ' গঠন করিলেন।

লালফৌজ ও পেট্রোগ্রাডের সহকারী সেনার সহযোগে ট্রট্স্কী কেরেন্সকী সরকারকে উচ্ছেদ করিলেন। এদিকে গ্রাম অঞ্চলে চাষীরা অভিজাতদের হাত হইতে জমি কাড়িয়া লইল। ৭ই নভেম্বর লেলিন ও ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে রুশে বলশেভিক সরকার স্থাপিত হইল। আজও প্রতি বছর এই দিনটি রুশ বিপ্লবের স্মরণীয় দিবস হিসাবে দেশে দেশে পালিত হয়।


ট্রট্স্কী

বিপ্লবের পরেই বলশেভিকরা বহু ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করিয়া জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করিল। দেশের সম্মুখে তখন দারুণ তুর্যোগ। লেলিন চেষ্টা করিলেন অতি দ্রুত সমাজবাদ প্রবর্তন করিতে। তিনি কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতে আনিলেন, চাষীদের মধ্যে জমি বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু সৈন্য ও শহরবাসীদিগকে খাওয়াইবার জন্য চাষীদের কাছ হইতে জোর করিয়া শস্য কিনিয়া আনা হইত। ইহার উপর দেখা দিল অজন্মা। চাষীদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ বাধিল। আরম্ভ হইল গৃহযুদ্ধ। সামন্ত ও শিল্পপতিরা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। তুইপক্ষই নির্মমভাবে বিপক্ষকে নির্মূল করিতে তৎপর হইল। ফরাসী বিপ্লবের ভীতির রাজত্বের পুনরাবৃত্তি হইল রুশবিপ্লবে এবং ষোড়শ লুইর মত দ্বিতীয় নিকোলাস ইহার বলি হইলেন।

গৃহযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসিল দুর্ভিক্ষ এবং তাহার পশ্চাতে বৈদেশিক আক্রমণ। বলশেভিকদের সাফল্য দেখিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মনে আতঙ্ক হইল—বুঝিবা তাহাদের মধ্যেও চাষীমজুররা হাঙ্গামা বাধাইবে এবং সমাজবাদ প্রবর্তন করিবে। তাহারা রুশ সামন্ত ও শিল্পপতিদের সাহায্যে অগ্রসর হইল। চারিদিক হইতে বিদেশী শত্রু নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিল। বিদেশী আক্রমণ রুশজনতার দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিল। তাহারা দলে দলে ট্রট্স্কীর লালফৌজে ভর্তি হইল এবং আক্রমণকারীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। ইহার পর গৃহশত্রুদিগকে দমন করিতে বেগ পাইতে হইল না।

পুনর্গঠন ঃ শান্তি ফিরিয়া আসিবার পর বলশেভিক দল কম্যুনিস্ট নাম লইয়া দেশকে সমাজবাদের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শুধু রুশদেশ নয়, সকল দেশের সমাজেই ছিল নানাপ্রকার বৈষম্য ও অবিচার। চাষী চাষ করে, মজুর কারখানায় খাটে, কিন্তু ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। আর জমিদার ও মালিক ঘরে বসিয়া এই হতভাগ্যদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। ইহার ফলে দেশ ধনী ও নিঃস্ব দুই শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায় এবং সমাজে শ্রেণী-বিরোধের অশান্তি চলিতে থাকে। সোভিয়েত সরকার চেষ্টা করিলেন এই বিভাগ তুলিয়া দিয়া এক শ্রেণীহীন সমাজ রচনা করিতে। ইহা করিতে হইলে বড় বড় সম্পত্তি সমাজ অথবা রাষ্ট্রের হাতে আনিতে হয় এবং তাহার লাভ যাহাতে সকলে ভোগ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। সোভিয়েত সরকার কলকারখানা শিল্পবাণিজ্য সব একে একে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে লাগিলেন।

লেলিনের মৃত্যুর পর স্টালিন সোভিয়েত রুশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমাজবাদী সংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। নিঃস্ব জনতার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইলে কেবল ধনীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করিয়া বিলাইয়া দিলেই চলিবে না, কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনও বাড়ানো চাই। স্টালিন পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া দেশের উৎপাদন-শক্তি বাড়াইলেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প প্রবর্তন করিলেন। কৃষি-সম্পদ বাড়াইবার জন্য কোথাও কোথাও গ্রামের চাষীদিগকে লইয়া যৌথ খামার খোলা হইল। ইহাতে চাষীদের ছোট ছোট ক্ষেত এক করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় যন্ত্রের সাহায্যে চাষ শুরু হইল। প্রত্যেক নাগরিককে নামমাত্র বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য বহু স্কুল কলেজ খোলা হইল। জনতার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইল, হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। জারের আমলে যে জাতি ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অনুন্নত, বিশবছরের মধ্যে তাহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতি রূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।


স্টালিন

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র: সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুরা নাম 'সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র'। এক কথায় ইহাকে সোভিয়েত বা পঞ্চায়েতী যুক্তরাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। গ্রাম ও নগরের পঞ্চায়েত জেলা-পঞ্চায়েত মনোনয়ন করে। জেলা-পঞ্চায়েত প্রদেশের পঞ্চায়েত মনোনয়ন করে। প্রদেশগুলি এবং সারা দেশের লোক মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত মনোনয়ন করে। এই সার্বভৌম সোভিয়েত সভা দেশের আইন সভা। যে সমস্ত দেশ বা জাতি

জারের অধীন ছিল তাহারা স্বায়ত্তশাসন পাইয়া প্রদেশ ও অঙ্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্র হইতে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র কম্যুনিস্ট দল জাতির জীবনে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। জাতির বহুমুখী উন্নতির মূলে আছে কম্যুনিস্ট দলের সংগঠন ক্ষমতা। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সোভিয়েত রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয় নাই। কারণ জনগণ সেখানে ইচ্ছামত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারে না। কেবল কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থিত প্রার্থীদের ভিতর হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হয়। কম্যুনিস্ট ভিন্ন অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারে না এবং দেশ শাসনে অংশ লইতে পারে না। সোভিয়েত রাষ্ট্রে এখনও কম্যুনিস্ট দলের একনায়কত্ব চলিতেছে।

উনিশ শতকে ইয়োরোপে জাতীয় জাগরণের ফলে বহু জাতি ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জন করিল। ইহাতেই জাতীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হইল না। পূর্বে যেমন রাজায় রাজায় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লইয়া লড়াই চলিত, এখন তেমন জাতিতে জাতিতে ক্ষমতা ও প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ইহার উপর আসিল উপনিবেশ ও বাণিজ্য লইয়া প্রতিযোগিতা। সাম্রাজ্যবিস্তার হইয়া দাঁড়াইল দেশপ্রেমের অঙ্গ। আফ্রিকার সোনা ও কাঁচামাল কে কতখানি হাত করিতে পারে, এশিয়ার বাজার কে কতটা একচেটিয়া করিতে পারে, চা কফি রবার তেল কে সংগ্রহ করিয়া বেচিতে পারে, ইহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক বিবাদের পরিণতি হইল দুটি বিশ্বযুদ্ধ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে পর পর দু'টি মহাসমর ঘটিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসে ইহার গভীর প্রভাব পড়িয়াছে। দু'টি যুদ্ধই জার্মানী শুরু করিয়াছিল বটে, তবুও সমস্ত দোষ একা জার্মানীর উপর দেওয়া যায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: ১৮৭০ সালে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয় এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রাশিয়ার অস্ত্রবলে সৃষ্টি হইল দুর্ধর্ষ জার্মান রাষ্ট্র। নবজাত জার্মানীর প্রতাপ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া গেল। বিসমার্কের লক্ষ্য হইল এক দিকে জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে অপরাজেয় করিয়া তোলা, অন্য দিকে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা।

শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার করিতে গিয়া উপনিবেশের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জার্মানী চীন ও আফ্রিকা ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। ১৮৯০ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বিসমার্ককে সরাইয়া নিজ হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব লইলেন। জার্মানীকে শিল্পবাণিজ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশস্পর্শী। ব্রিটিশের মত জার্মান সাম্রাজ্যও পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তৃত হইবে, সকল দেশ জার্মানীর প্রাধান্য মানিয়া লইবে, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সার্থক করিবার জন্য তিনি জার্মানীর নৌবল সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।


কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া অন্যান্য রাষ্ট্র ভয় পাইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশের সহিত জার্মানীর তীব্র প্রতিযোগিতা চলিল। ইংলণ্ডের ভয় হইল জার্মানী তাহার পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যে ভাগ বসাইবে, তাহার শিল্পপণ্যের বাজারে ঢুকিয়া পাল্লা দিবে এবং সমুদ্রপথে তাহার নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। ১৮৭০ সালে যুদ্ধে হারিয়া ফ্রান্স মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিজয়ী প্রাশিয়া তাহার সীমান্ত প্রদেশ আল্‌সাস্ ও লোরেন ছিনাইয়া লইয়াছিল। উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সমস্ত ফরাসী জাতি ব্যগ্র হইয়া উঠিল। রুশের বিবাদ ছিল জার্মানীর মিত্র অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে তুর্ক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা হাটে এই দুই সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ক্রমশঃ জার্মানীও পূর্বদিকে প্রভাব বিস্তারে তৎপর হইল।

১৮৭৯ সালে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মধ্যে এক কূটনৈতিক

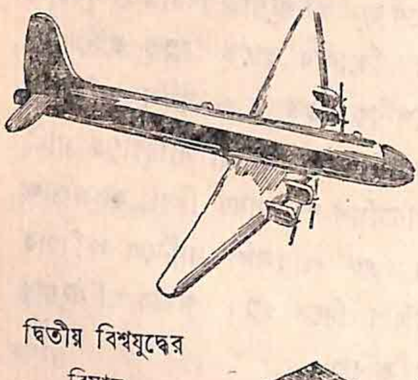
চুক্তি হইল। পরে ইতালীও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল। মধ্য ইয়োরোপে এই তিন শক্তি মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স, রুশ এবং ইংলণ্ডও পরস্পর হাত মিলাইল। উভয় পক্ষই সাধ্যমত সেনাবল ও নৌবল বাড়াইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে ইয়োরোপে যখন বারুদের স্তূপ জমিয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ একদিনের ঘটনায় তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। অস্ট্রিয়ার অধীন বস্‌নিয়া প্রদেশে ছিল সার্ব জাতির বাস। পাশেই সার্বদের স্বাধীন রাজ্য সার্বিয়া। বস্‌নিয়ায় সার্বদের মুক্তি-আন্দোলন চলিতেছিল। ১৯১৪ সালের ২৮ শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাণী বস্‌নিয়ার রাজপথে এক সার্ব বিপ্লবীর হাতে নিহত হইলেন। আততায়ী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর নাগরিক, হত্যাকাণ্ড ঘটিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাজ্যে, তবু ইহার জন্য অস্ট্রিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য সার্বিয়াকে দায়ী করিল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়া কতকগুলি দাবির এক তালিকা পাঠাইল। এই দাবিগুলি মানিলে সার্বিয়ার শাসনভার অস্ট্রিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে হয়। জবাব অস্ট্রিয়ার পছন্দ হইল না। সে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

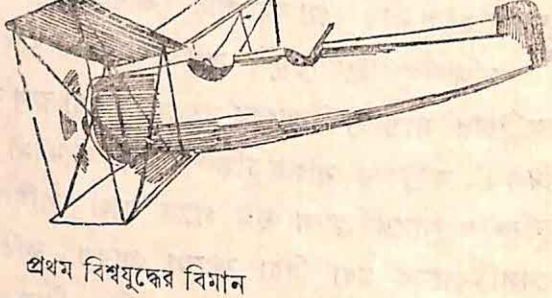
দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে রুশ ও অস্ট্রিয়ার বিবাদ লাগিয়াই ছিল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের মতলব দেখিয়া রুশ সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দিল। অস্ট্রিয়ার সহিত চুক্তি অনুসারে জার্মানী এবং রুশের সহিত চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স দুই পক্ষে যুদ্ধে নামিল। জার্মান সেনা বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার অপরাধে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পরে তুর্কী ও বুলগেরিয়া লইল জার্মানীর পক্ষ, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া ইতালী জাপান আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র চীন প্রভৃতি একে

একে লইল রুশ ও ফ্রান্সের পক্ষ। চার বছর ধরিয়া পৃথিবী জুড়িয়া মহাসমরের তাণ্ডব চলিল।

ইহার পূর্বেও দেশে দেশে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ যুদ্ধের ব্যাপ্তি ও বিভীষিকা পূর্ববর্তী সমস্ত যুদ্ধকে ছাড়াইয়া গেল। ইহার তাণ্ডব হইতে কোন মহাদেশ ও কোন মহাসমুদ্র রক্ষা পায় নাই। ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত ও রুশের পশ্চিম সীমান্ত ছিল মূল কুরুক্ষেত্র। কিন্তু মেসোপোটামিয়া, চীন, আফ্রিকার উপনিবেশ, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তুই দলে শক্তি পরীক্ষা হইল।



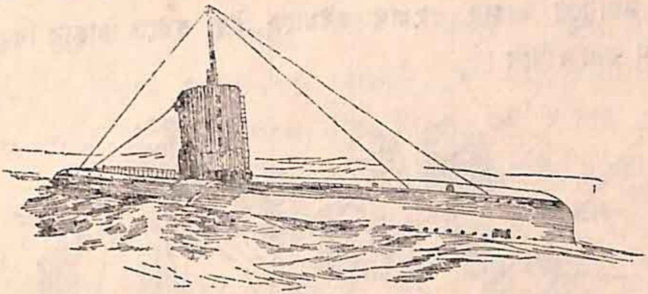
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিমান



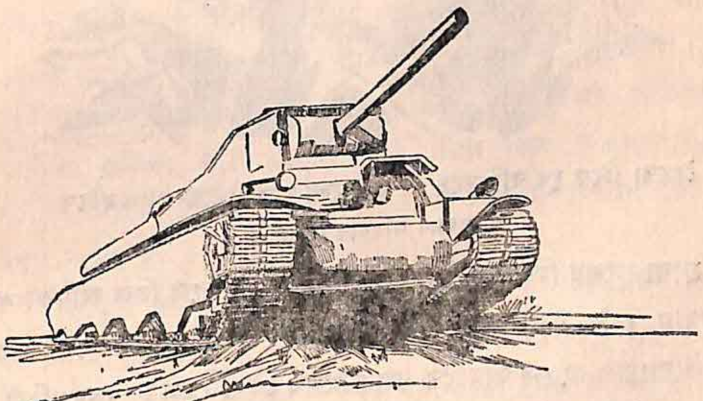
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিমান

শুধু জলে স্থলে নয়, আকাশে ও জলের নীচেও যুদ্ধ চলিল। আকাশে বিমান উড়িয়া নীচে শহর ও সেনাসমাবেশের উপর সর্বধ্বংসী বোমা ফেলিল। জলের তল হইতে ডুবো জাহাজ টর্পেডো মারিয়া জাহাজ ডুবাইল। স্থলযুদ্ধে নানাপ্রকার নূতন মারণাস্ত্রের

প্রয়োগ হইল। ধাবমান পাহাড়ের মত ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির সহযোগে মুহূর্তে হাজার হাজার শত্রু নিপাত করিবার পন্থা বাহির হইল।



ডুবো জাহাজ



ট্যাঙ্ক

সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ বা পরিখা কাটিয়া তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুর উপর গুলি বর্ষণ করিত। মাথার উপর হইতে পড়িত কামানের গোলা, বোমা বা শেল কিংবা দম-আটকানো গ্যাস। এই মহাযুদ্ধে কত ক্ষতি ও প্রাণহানি হইয়াছে তাহার কোন হিসাব হয় নাই। বলশেভিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র রুশের বার লক্ষ

লোক নিহত ও আহত হয়। লুসিটানিয়া নামে যাত্রিজাহাজ টর্পেডোর আঘাতে বারশ' শিশু ও নরনারী লইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সংহার-যন্ত্রের কতখানি উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং কি ভাবে প্রথম মহাযুদ্ধে তাহার প্রয়োগ হইয়াছে ইহা হইতে তাহার কিছুটা অনুমান করা যাইবে।



সৈন্যরা টেঞ্চে যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের মুখে বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার মুখোশ।

ফ্রান্স-রুশের মিত্রপক্ষ ছিল দলে ভারি। এই দলে ছিল অধিকাংশ শক্তিমান রাষ্ট্র এবং বহু ছোট ছোট দেশ। চার বছর যুদ্ধের পর মধ্য-ইয়োরোপ-চক্রের সামরিক বল নিঃশেষ হইয়া গেল। বুলগেরিয়া, তুর্কী ও অস্ট্রিয়া একে একে আত্মসমর্পণ করিল। তখন জার্মানীও বাধ্য হইয়া ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতির চুক্তি করিল। তাহার পর হইতে বছরের এই দিনটি যুদ্ধবিরতি হিসাবে পালিত হইয়া আসিতেছে।

ভার্সাই সন্ধি ও জাতিসঙ্ঘ : প্যারি শহরে শান্তিবৈঠক বসিল। অনেক আলোচনার পর সকলের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া

ভার্সাই শহরে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। বিজিত দেশগুলির কিছু কিছু অংশ অধিকার করিয়া বিজেতা দেশগুলি তাহাদের রাষ্ট্র-সীমানা বাড়াইল। ইয়োরোপের পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা পাইল। ইহার ফলে অস্টিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল। কিন্তু স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের নীতি ইয়োরোপের বাহিরে কোথাও মানা হয় নাই। ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশ পরাধীন রহিয়া গেল।

জার্মানীর উপর বিজেতা মিত্রদল কঠোর প্রতিশোধ লইল। আফ্রিকা ও এশিয়ায় তাহার যত উপনিবেশ ছিল সব তাহারা ভাগাভাগি করিয়া লইল। তাহার শিল্পাঞ্চল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভোগ দখল করিতে লাগিল। তাহার সামরিক বল একেবারে ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ইহার উপর জার্মানীর ঘাড়ে চাপানো হইল বিপুল অর্থদণ্ডের বোঝা। ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর বুকে শান্তি আনিল না, আনিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, লাঞ্ছনা। তিল তিল করিয়া জার্মান-জাতির অন্তরে তিক্ততা জমিয়া উঠিল। আবার এক মহাপ্রলয়ের জন্য ইন্ধন সঞ্চিত হইতে লাগিল।

বহু ভুল ত্রুটি এবং অন্যায় সত্ত্বেও ভার্সাই সন্ধি একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। এই সন্ধিচুক্তির বলে সৃষ্টি হইল বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য প্রথম অন্তর-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার নাম জাতিসঙ্ঘ। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন ইহার উদ্ভাবক। জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আপস-মীমাংসা দ্বারা শান্তিরক্ষা করা। প্রথমে বিজয়ী ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া এক সঙ্ঘ গঠিত হয়। পরে জার্মানীকেও গ্রহণ করা হইল। ইহার কেন্দ্র হইল সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহর। হল্যাণ্ডের হেগ শহরে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটি বিশ্ব-বিচারসভাও স্থাপিত হইল।

জাতিসঙ্ঘ ও বিচারসভা কিছু কিছু ছোটখাটো বিবাদ মিটাইল বটে কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যলিপ্সা দমন করিতে পারিল না। জাপান মাঞ্চুরিয়া ও ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে পর চীন ও আবিসিনিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে জার্মানীও বেপরোয়াভাবে জাতিসঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিল। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে একেবারেই যোগ দেয় নাই। পরে জাপান, ইতালী ও জার্মানী একে একে জাতিসঙ্ঘ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ক্ষীয়মান জাতিসঙ্ঘ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: প্রথম মহাযুদ্ধের পিছনে পিছনে আসিল নিদারুণ আর্থিক দুর্গতি। সবচেয়ে অসহ্য হইয়া উঠিল ইতালী ও জার্মানীর অবস্থা। সরকারী তহবিলে প্রচুর ঘাটতি ও ধার, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, বেকার যুবকদের সংখ্যা বাড়িতেছে, অনেক কারখানা ও জমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশের সরকার দারিদ্র্য দূর করিতে পারিতেছেন না। এই অসহায় অবস্থায় ইতালী ও জার্মানীতে দেখা দিল গণতন্ত্রবিরোধী জাতীয় বিপ্লব।



মুসোলিনি

ইতালী মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল কিছু প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু জুটিল না। আশায় বঞ্চিত হইয়া ইতালীর রাজনৈতিক মহল ছিল বিক্ষুব্ধ। জনতার দুর্গতি ও অসন্তোষের সুযোগ লইয়া মুসোলিনি ১৯১৯ সালে ফাসিস্ত দল গঠন করিলেন এবং ১৯২২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া ইতালীতে দলের

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। জার্মানীতে অনুরূপ অবস্থায় হিটলার নাৎসি দল গঠন করিলেন এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে একনায়কত্ব স্থাপন করিলেন।

মুসোলিনি এবং হিট্‌লারের আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি ছিল প্রায় একই প্রকার। উভয়েই জাতীয় ঐক্য, মুক্তি ও সাম্রাজ্যের জিগির তুলিলেন। এক লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বে সমস্ত জাতিকে সংহত হইতে হইবে। সামরিক বলে বলীয়ান হইয়া ভার্সাই সন্ধি চূর্ণ করিয়া জাতীয় গৌরব ও ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। আইন-সভার দলাদলি ও বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া এ কাজ হইবে না। এ কাজ হইবে শক্তি, শৃঙ্খলা ও সাহসের দ্বারা। সুতরাং গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়া একতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। দল ও দলনেতার নির্দেশ অন্ধভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।


হিট্‌লার

মুসোলিনি ও হিট্‌লার ক্ষমতা হাতে লইয়া অর্থসঙ্কট দূর করিলেন, পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ রণসম্ভারে দেশকে সজ্জিত করিলেন। সকল বিরোধী দলকে উচ্ছেদ করিলেন। দুই রাষ্ট্র মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইল। প্রাচ্যে জাপানেও দেখা গেল একই ধরনের একতন্ত্র ও সামরিক প্রস্তুতি। ইতালী, জার্মানী ও জাপান— এই তিন দেশ লইয়া এক সামরিক অক্ষ রচিত হইল। আবার পৃথিবীর আকাশে মেঘ ঘনাইয়া উঠিল।

কয়েক বছরের মধ্যে জার্মানীর সামরিক ও আর্থিক বল ফিরাইয়া আনিয়া হিট্‌লার ভার্সাই বন্দোবস্ত চুরমার করিতে লাগিলেন। দেশের উপর হইতে তিনি ইংরাজ ও ফরাসী জুলুম

দূর করিলেন, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান অঞ্চল জোর করিয়া দখল করিলেন। বলশেভিক রুশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে নাৎসি জার্মানীর বিরুদ্ধে চুক্তি করিতে চাহিল। কোন সাড়া না পাইয়া সে জার্মানীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করিয়া বসিল। এই প্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্ব চুক্তি অনুসারে পোল্যাণ্ডের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পৃথিবীর উপর দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা নামিয়া আসিল।

অল্প দিনের ভিতর পোল্যাণ্ডের পতন হইল। ইহার পর ফ্রান্সও টিকিতে পারিল না। তখন অক্ষচুক্তি অনুসারে প্রথমে ইতালী ও পরে জাপান জার্মানীর পক্ষ লইল। ইংলণ্ডের পক্ষে পর পর যোগ দিল চীন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ; পরে জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সোভিয়েত রুশ আসিয়া এই দলে মিলিত হইল। জার্মানী ও রুশে শক্তিপরীক্ষা হইল পূর্ব ইয়োরোপে, জার্মানী ও ইংলণ্ডে হইল উত্তর পশ্চিম ইয়োরোপে। ইতালী ও জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ড লড়িল উত্তর আফ্রিকায় আর আমেরিকা ও জাপানের যুদ্ধ হইল পূর্ব এশিয়ায়। স্পেন ভিন্ন প্রায় সমস্ত ইয়োরোপ ও উত্তর আফ্রিকা জার্মানী ও ইতালীর পদানত হইল। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। জাপানী সেনার পুরোভাগে ভারতে প্রবেশ করিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। রুশের অভ্যন্তরে মস্কোর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল দুর্মদ জার্মানবাহিনী।

এমন সময়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিল। আমেরিকার প্রচুর ধনবল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও রুশের লোকবল এবং মিত্রপক্ষের উপনিবেশের সম্পদ,—সমস্ত আনিয়া জার্মানী ও জাপানী সেনাবলের বিরুদ্ধে

সমাবেশ করা হইল। আমেরিকার রুজভেল্ট, ইংলণ্ডের চার্চিল ও রুশের স্টালিন, এই তিন রাষ্ট্রনায়কের ধৈর্য ও সংগঠনশক্তি মিলিত হইয়া জার্মানী ও ইতালীকে ঘিরিয়া মারণচক্র রচনা করিল। অক্ষশক্তি প্রথম প্রতিহত হইল রুশে, তারপর উত্তর আফ্রিকায়। সেখান হইতে মিত্রশক্তি ইতালীতে অবতরণ করিল, ইতালীকে পরাস্ত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। মুসোলিনী ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নিহত হইলেন। তখন মিত্রশক্তি জার্মানীকে পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করিল। পূর্বে রুশের ও পশ্চিমে ইঙ্গ-আমেরিকার আক্রমণের জাঁতাকলে পড়িয়া জার্মানী পরাজয় স্বীকার করিল। হিট্‌লার শেষ পর্যন্ত বার্লিনে রহিলেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করিলেন। বাকি রইল জাপান। প্রথম জয়যাত্রার পর জাপানী সৈন্য ব্রহ্ম, মালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া পিছে হটিতেছিল। আমেরিকা প্রচণ্ড আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের অবশিষ্ট শক্তি নিঃশেষ করিল।


চার্চিল

ছয় বৎসর ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা অতি সামান্য। বস্তুতঃ এ যুদ্ধে মানুষ কেবল বুদ্ধি খাটাইয়াছে ও নির্দেশ দিয়াছে,—যুদ্ধ করিয়াছে যন্ত্রদানব। পাতাল হইতে ডুবো জাহাজ ও আকাশ হইতে বোমারু বিমান অবিরাম মৃত্যুবর্ষণ করিয়াছে। সমস্ত জাতির শেষ বিন্দু শক্তি ও সম্পদ আহরিত হইয়া সৈনিক ও তাহার সরঞ্জামের পিছনে ব্যয় হইয়াছে। অধিকৃত অঞ্চলে বিজয়ী সেনা চরম শোষণ ও নির্যাতন চালাইয়াছে, বিদ্রোহীদিগকে ধরিয়া নরককুণ্ডের ন্যায় বন্দিশালায়

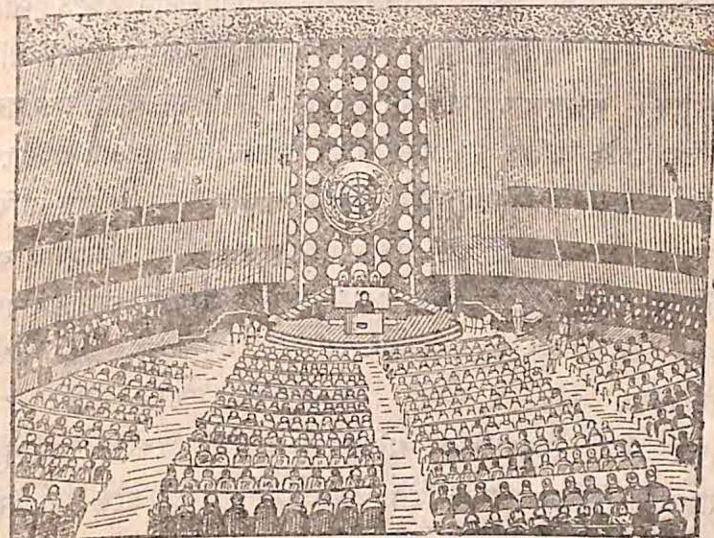
আটক রাখিয়াছে। নির্দোষ দরিদ্র প্রজা,—যুদ্ধের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারাও মৃত্যুর আশঙ্কায় দিন কাটাইয়াছে অথবা অসহ্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। শুধুমাত্র দু'টি আণবিক বোমার আঘাতে জাপানের কত হাজার নিরপরাধ নরনারীর প্রাণ গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।


রুজভেল্ট

রাষ্ট্রপুঞ্জ ও যুদ্ধোত্তর সঙ্কট: এত দণ্ড দিয়াও মানুষের কপালে শান্তি মিলিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিজেতাদের মধ্যে মনান্তর দেখা দিল। এই মনান্তর ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। দুই দলের ও মতের ব্যবধান বাড়িতে বাড়িতে পৃথিবী দুই বিরোধী শিবিরে ভাগ হইয়া গেল। এক দিকে প্রাচ্য শিবির, ইহার নায়ক সোভিয়েত রুশ, তাহার সঙ্গে জুটিয়াছে নয়া চীন ও পূর্ব ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল। অন্য দিকে পাশ্চাত্য শিবির,—ইহার নেতা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহাতে আছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আরো অনেক দেশ। ভারতবর্ষ এবং আরো কোন কোন দেশ নিরপেক্ষ আছে। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় ও শক্তিতে দুই শিবিরের তুলনায় নগণ্য। প্রথম পক্ষ কম্যুনিস্ট দলের একনায়কত্বে সমাজবাদ প্রবর্তন করিতে চায়। দ্বিতীয় পক্ষ গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা অটুট রাখিতে চায়। উভয় পক্ষের বিরোধিতার ফলে পরাজিত জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম

দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া আছে এবং দুই রাষ্ট্র দুই দলে যোগ দিয়াছে।

প্রবল ঈর্ষা ও বিদ্বেষের মধ্যেও জাতিসমূহের শান্তিপ্রচেষ্টা চলিতেছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধের সংহারমূর্তির কথা ভাবিলে দুঃসাহসী যুদ্ধবাজকেও নরম হইতে হয়। মানুষের শুভবুদ্ধি ও শান্তি-কামনা হইতে বিগত মহাযুদ্ধের পরে জন্মলাভ করিয়াছে 'রাষ্ট্রপুঞ্জ'।



রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিদের সভা

ইহা জাতিসঙ্ঘেরই নয়া সংস্করণ। দুনিয়ার ছোটবড় রাষ্ট্রের অধিকাংশ এই সঙ্ঘের সভ্য। এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার কাজে ভারতবর্ষ পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া আসিতেছে। একটি সংবিধান বা সনদের উপর এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত। সনদে সকল রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রনির্বিশেষে সকল মানুষকে কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের হাতে যে ক্ষমতা ছিল

রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে তাহার চেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ কোথাও কোথাও বিবাদের মীমাংসা করিয়াছে, কোথাও কোথাও এক রাষ্ট্রের উপর অন্য রাষ্ট্রের জুলুম কিংবা হামলা বন্ধ করিয়াছে।

যুদ্ধ নিবারণ করিয়া পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করা ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক কাজও আছে। দেশে দেশে যাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও শিল্পকলার আদানপ্রদান হইতে পারে, তাহার জন্য 'রাষ্ট্রপুঞ্জ-শিক্ষা-বিজ্ঞান-ও-সাংস্কৃতিক সংগঠন' গঠিত হইয়াছে। যাহাতে মহামারী নিবারণ হয়, জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকল জাতির চেষ্টা মিলিত হয়, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন' তাহার ভার লইয়াছে। যাহাতে এক বিশ্বব্যাঙ্কে সকল দেশের সরকার টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারে এবং প্রয়োজন মত সেখান হইতে ঋণ লইয়া গঠনমূলক কাজ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক সংগঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক সম্পূর্ণ নূতন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রমব্যবস্থা, খাদ্য ও কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে অন্তর-রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের আওতায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে পরস্পরের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করিল। পশ্চিম গোলার্ধে দুই মহাদেশে এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে ইতঃপূর্বে আদিম জাতিদিগকে উৎখাত করিয়া শ্বেত জাতিরা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আফ্রিকায় আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া ছাড়া কোন স্বাধীন দেশ রহিল না। এশিয়ার প্রাচীন দেশগুলিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী, পর্তুগাল, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ঘাটি করিয়া বসিল। কোন কোন বিজিত দেশ সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যের অধীন হইল। কোন কোন দেশ বিদেশী প্রভাবের কবলে পড়িয়া নামমাত্র স্বাধীনতা বজায় রাখিল।

প্রাচ্যের পরাধীন বা অর্ধপরাধীন দেশগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে জাতীয় চেতনা জাগিয়া উঠিল। ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশ প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মদাতা। সেই সভ্যতার ধারা এবং বিদেশী শাসনের চাপ ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল। উনিশ শতকে যেমন ইয়োরোপে দেখা গিয়াছিল বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম, বিশ শতকে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল এশিয়া ও আফ্রিকায়। যে সমস্ত প্রাচ্য দেশ দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন: ইংরাজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার আগে এ দেশ ছিল গ্রামনির্ভর। শুধু ক্ষেতের ফসল

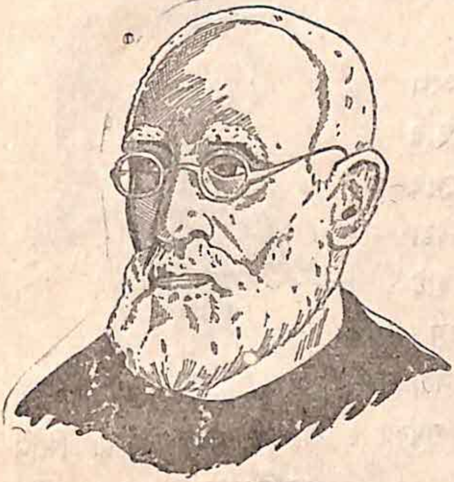
নয়, নিত্য ব্যবহারের জিনিসও প্রায় সমস্তই উৎপন্ন হইত দেশের গ্রামাঞ্চলে। ইংরাজ রাজত্বে এই গ্রামীণ অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেল। কোম্পানির বণিকরা এদেশের কারিগরি শিল্প নষ্ট করিয়া বিদেশী পণ্য চালু করিল। কোম্পানির আইন এদেশের ভূমিব্যবস্থাও নষ্ট করিল। কোথাও চাষী খাজনা দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হইল, কোথাও বা তাহার জমি জমিদারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। এদিকে ইংরাজের ছত্রচ্ছায়ায় সৃষ্টি হইল এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে কেহ জমিদার, কেহ চাকুরিজীবী, কেহ উকিল, কেহ বা শিক্ষক। ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিবার ফলে ইহাদের উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও জাতীয়তার প্রভাব পড়িল। ইহারা চাহিল ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কার ও ভেদাভেদ হইতে মুক্ত করিয়া সংশোধন করিতে। রাজা রামমোহন রায় প্রথম এই আন্দোলন আরম্ভ করেন।



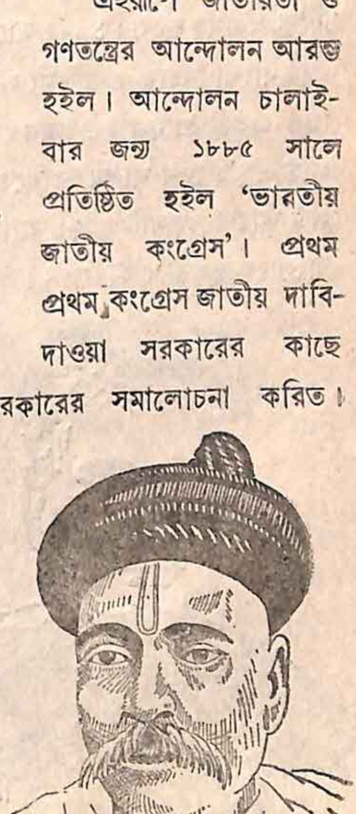
রাজা রামমোহন রায়

ক্রমশঃ সংস্কার আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ সরকারী পদ লাভ করিয়া দেশের ভাগ্য চালনা করিবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়-দিগকে সহজে আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করিতে দিতেন না। ইহার উপর আবার দু'টি আইন করিয়া ভারতীয়দের অস্ত্র রাখিবার অধিকার ও

দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইল। শিক্ষিত শ্রেণী বুঝিল যে অধিকার আদায় করিতে হইলে সংগঠন ও একতার প্রয়োজন। আর দেশের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধি থাকা দরকার।


রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইরূপে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হইল। আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। প্রথম প্রথম কংগ্রেস জাতীয় দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করিত এবং দরকার হইলে সরকারের সমালোচনা করিত। কিন্তু কোন দাবিই বড় একটা পূর্ণ হইত না। কংগ্রেসের স্রষ্টা জাতীয় নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটিশ সরকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া জাতীয় নেতারা ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন যে কেবল আবেদন নিবেদনে কাজ হইবে না, আন্দোলনের চাপ বাড়াইতে হইবে। কংগ্রেসের ভিতর কোথাও কোথাও চরমপন্থী মনোভাব দেখা দিল। তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে,


লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

অরবিন্দের নেতৃত্বে বাংলায় এবং লাজপত রায়ের নেতৃত্বে পঞ্জাবে চরমপন্থী বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। বিপ্লবীরা ভারত হইতে ইংরাজ শাসন একেবারে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প লইল।



অরবিন্দ ঘোষ

এমন সময়ে একটি ঘটনার ফলে জাতীয় আন্দোলন দ্রুত চরমপন্থার দিকে অগ্রসর হইল। ১৯০৫ সালের পূর্বে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া ছিল একটি প্রদেশ। একজন ছোট লাট এই প্রদেশ শাসন করিতেন। লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া আসিয়া বাংলাকে দুইভাগ করিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম যুক্ত করিয়া তিনি একটি নূতন প্রদেশ গড়িলেন। পশ্চিমবঙ্গ আগের মত বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে রহিল। কার্জন বলিলেন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশটি অত্যন্ত বড়। বাংলাকে ভাগ করিয়া দুইটি প্রদেশের সঙ্গে জুড়িয়া দিলে শাসনকার্যের সুবিধা হইবে। জাতীয় নেতারা ভাবিলেন এই বিভাগের দ্বারা বাংলার অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। বাংলার নিজস্ব ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আছে এবং বাংলাই জাতীয়



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আন্দোলনের মেরুদণ্ড। বস্তুতঃ বাংলাকে দুইখণ্ড করিয়া বিনাশ করিবার এ এক চক্রান্ত। কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত উত্থিত হইল। কংগ্রেসের ভিতর একদল কর্মী চরমপন্থা ধরিয়া চলিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে দিলেন জাতীয়তার মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'। বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলিয়া তরুণরা সভাসমিতি করিল, মিছিল বাহির করিল। বিলাতী কাপড় ও অন্যান্য জিনিস বর্জন করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের রেওয়াজ দেখা দিল। বিলাতী জিনিসের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করিতে লাগিল। আন্দোলন বাংলা ছাড়াইয়া সুরাট, পঞ্জাব ও মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

ইংরাজ সরকার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। আন্দোলন দমন করিবার জন্য কড়া আইন পাশ হইল। সভাসমিতি বন্ধ করিবার হুকুম জারি হইল। খবরের কাগজের লেখার উপর নানা-প্রকার বিধিনিষেধ চাপানো হইল। রাজদ্রোহের অপরাধে অনেকের শাস্তি হইল। অনেককে বিনাবিচারে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল। ইহাতেও আন্দোলন দমিল না। পুলিশের অত্যাচারে যখন প্রকাশ্যভাবে কিছু করা সম্ভব হইল না তখন অনেকে গুপ্ত পথ ধরিল। বিপ্লবীরা গুপ্ত সমিতি গড়িল, বন্দুক পিস্তল সংগ্রহ করিয়া ও বোমা বানাইয়া সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের কার্যপ্রণালী হইল অত্যাচারী আমলাদিগকে হত্যা করিয়া সরকারী মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তারপর সশস্ত্র বিদ্রোহ করা। বিপ্লবীরা ষোল বছর বয়সের কিশোর ক্ষুদিরামকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যার নূতন ছোটলাটকে হত্যা করিতে পাঠাইল। ভুল ক্রমে তাহার বোমার আঘাতে অন্য এক ব্যক্তি নিহত হইল। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইল। সেই হইতে দেশের লোক ক্ষুদিরামকে আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক বলিয়া সম্মান করিয়া আসিতেছে।

অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করিলেন। ১৯১১ সালে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা এক করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল।

তারপর আসিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়া তখন ইংলণ্ড বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই দুঃসময়ে ভারতীয় সেনা ইংরাজ সেনার পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু যুদ্ধে সাহায্য করিয়াও ইংরাজদের নিকট হইতে ভারতীয়রা বিশেষ কোন অধিকার লাভ করিল না।



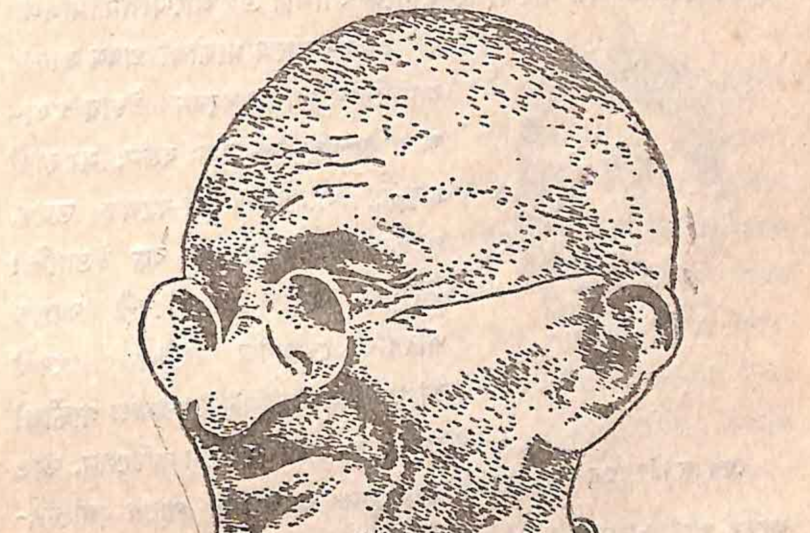
ক্ষুদিরাম

বরং দেখা গেল সরকার দমননীতি চালাইতে বদ্ধপরিকর। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে একটি জায়গায় কয়েক হাজার নরনারী সভা করিতেছিল। এই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইয়া ইংরাজ ফৌজ শত শত লোককে হত্যা করিল। এই হত্যাকাণ্ড আবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগাইয়া তুলিল।

এই সময় দেশে এক উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হইল। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব লইয়া ভারতীয়দের জন্য এক নূতন যুদ্ধরীতি আবিষ্কার করিলেন। ইহার নাম সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ সত্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া। সত্যাগ্রহীর মনে অত্যাচারীর প্রতি হিংসা থাকিবে না এবং সে অত্যাচারীর গায়ে হাত তুলিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়রা যখন ভারতীয়দের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতেছিল তখন মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ

করিয়া ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা করেন। এবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি এই সত্যাগ্রহের পথ ধরিলেন।

তখন পাকিস্থান ছিল ভারতবর্ষের অংশ এবং ভারতবর্ষে ছিল



মহাত্মা গান্ধী

বহু মুসলমানের বাস। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কী ছিল জার্মানীর পক্ষে এবং ইংলণ্ডের বিপক্ষে। তুর্কীর সুলতান ছিলেন সারা পৃথিবীর মুসলমানদের খলিফা ধর্মগুরু। যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয়ের পর

সুলতানের উপর ইংলণ্ড অপমানজনক সন্ধিশর্ত চাপাইল। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মে আঘাত লাগিল। তাহারা খলিফার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আসিয়া এই আন্দোলন মিলিল।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ.

১৯২০ সালে গান্ধীজী প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহার প্রধান অঙ্গ ছিল বিলাতী দ্রব্য বর্জন, সরকারী চাকুরি, আদালত স্কুল-কলেজ ত্যাগ, আইন অমান্য, খাজনা বন্ধ ইত্যাদি। বিলাতী বস্ত্র ছাড়িয়া দেশী কাপড় পরিবার রেওয়াজ হইল। দেশী কাপড়ের অভাব মিটাইবার জন্য গান্ধীজী ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন করিলেন, তাঁত বসাইলেন। গান্ধীজীর পাশে আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি প্রভৃতি দেশনেতা। সরকার আন্দোলন থামাইবার জন্য দমননীতি প্রয়োগ করিলেন। দেশ জুড়িয়া ধরপাকড় চলিল। এমন সময়ে এক দল ক্ষিপ্ত জনতা উত্তরপ্রদেশে চৌরিচওরার থানা আক্রমণ করিয়া পুলিশদিগকে হত্যা করিয়া বসিল। হত্যা সত্যাগ্রহের নীতির বিরোধী। সুতরাং গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী দ্বিতীয়বার জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার আন্দোলন শুরু হইল লবণ আইন অমান্য করিয়া। সত্যাগ্রহীরা বে-আইনীভাবে লবণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে চলিল বিলাতী-বর্জন, চরকা, সভা, মিছিল প্রভৃতি। এবার সরকার কঠোর-ভাবে দমননীতি চালাইয়া আন্দোলন নষ্ট করিলেন। বহু জায়গায়

লাঠি ও গুলি চলিল, হাজার হাজার সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইল, সভা-সমিতি বই সংবাদপত্র ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইল। যখন প্রকাশ্যভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিছু করিবার পথ রহিল না, তখন আবার বিপ্লবীরা সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী প্রাণ হারাইলেন।

শাসন সংস্কার : এদিকে আন্দোলনের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কিছু কিছু জাতীয় দাবি মিটাইবার চেষ্টা করিলেন। ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালে পর পর ভারত-শাসন ব্যবস্থার সংস্কার হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে কিছু কিছু করিয়া ভারতীয়কে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভায় নির্দিষ্টসংখ্যক আসনে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে স্থান দেওয়া হইল। ইহার ফলে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি দেশের আইন রচনায় অংশ লইবার এবং সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইলেন। এই সামান্য সুবিধা পাইয়া জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না।

ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত শাসন-সংস্কারের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে ত্রুটি করিলেন না। সমস্ত জনসাধারণকে নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল না, অধিকার পাইল অল্পসংখ্যক অবস্থাপন্ন লোক। আইনসভায় ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যতীত সরকারের নিজস্ব মনোনীত সদস্য। মন্ত্রীদিগকে মনোনয়ন করিতেন কেন্দ্রে বড়লাট, প্রদেশে ছোটলাট। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে আবার হিন্দু ও মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইল। এত করিয়াও আসল ক্ষমতা আইনসভাগুলির হাতে দেওয়া হইল না। আসল ক্ষমতা রহিল ইংলণ্ডের সরকার, বড়লাট, ছোটলাট ও আমলাদের হাতে। পুলিশ বিভাগ, সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক দপ্তর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনসভাগুলির কোন হাত রইল না।

আগস্ট বিদ্রোহ ও আজাদ হিন্দ ফৌজঃ দেশব্যাপী অসন্তোষের মধ্যে আরম্ভ হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজ সরকার ভারতীয় আইনসভার মতের অপেক্ষা না করিয়া ভারতবর্ষকে নিজের পক্ষে যুদ্ধে নামাইলেন। কংগ্রেস স্থির করিল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা না দিলে তাহারা যুদ্ধে সহযোগিতা করিবে না। বার বার আবেদন করিয়াও যখন ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ভারত-ব্যাপী গণসংগ্রাম পরিচালনা করিবার প্রস্তাব লইল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়া মাত্র সরকার কংগ্রেস নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন।

ইহার পর জনসাধারণের বিক্ষোভ আর বাঁধ মানিল না। নানা-স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। কোথাও কোথাও আঞ্চলিক শাসন অচল হইল, জনশাসন স্থাপিত হইল। রেললাইন ভাঙিয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর চলাচলে বাধা দিতে লাগিল। সরকার বেপরোয়াভাবে গুলি, লাঠি ও গ্রেপ্তার চালাইতে লাগিলেন।

সৈনিক ও পুলিশের বলে যখন জনবিদ্রোহ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে, সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে আর এক দিক হইতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া গিয়া জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জাপানী ফৌজের হাতে যখন মালয় ও ব্রহ্মের পতন হইল তখন তিনি ডুবো জাহাজে ছ' হাজার মাইল সমুদ্রপথ পার হইয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া জাপানে আসিলেন। যে সমস্ত ভারতীয় সেনা জাপানীদের হাতে বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া তিনি এক জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন। সিঙাপুরে তাঁহার নেতৃত্বে এক স্বাধীন জাতীয় সরকার স্থাপিত হইল। এই সরকারের সঙ্গে

জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মিত্রতা হইল। ১৯৪৩ সালে নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানী বাহিনীর অগ্রভাগে ভারতের মধ্যে কোহিমা ও ইম্ফল পর্যন্ত প্রবেশ করিল। এমন সময় অক্ষদলের পরাজয় আরম্ভ হইল, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পিছনে হটিয়া গেল।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরাস্ত হইলেও তাঁহাদের কীর্তি সমস্ত দেশের বুকে অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিল। ইংলণ্ডের সরকার দেখিলেন যে ভারতবর্ষকে আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না। কয়েকজন ইংরেজ মন্ত্রী আপস আলোচনার জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। কংগ্রেস দাবি করিল সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ভারতীয়রাই দেশের ভবিষ্যৎ স্থির করিবে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান মুস্‌লিম লীগ ও তাহার নেতা মহম্মদ আলি জিন্না দাবি করিলেন যে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের মধ্যে মতের অমিল হওয়ায় আপস আলোচনা ভাঙিয়া গেল।

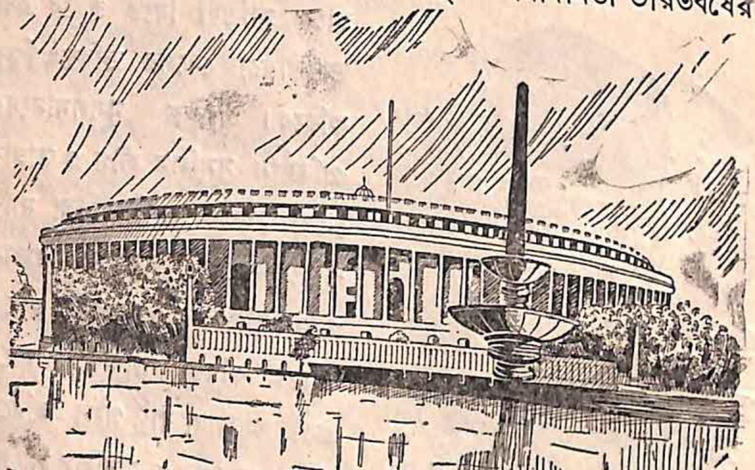

নেতাজী সুভাষ

কংগ্রেস ও লীগের মতবিরোধ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যবসিত হইল। বাংলা, বিহার, পঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু মুসলমান নৃশংসভাবে পরস্পরের হত্যায় মাতিয়া উঠিল। অবশেষে কংগ্রেস বাধ্য হইয়া ভারত বিভাগে স্বীকৃত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার

সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করিলেন। দেশ বিভাগ করিয়া ভারত ও পাকিস্থান দুই স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রধান পরিষদ স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করিল এবং ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইল। প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং প্রধান মন্ত্রী হইলেন জওহরলাল নেহেরু।


মহম্মদ আলি জিন্না

স্বাধীনতাত্তোর যুগে দেশোন্নতি—বহুযুগের পরাধীনতা ভারতবর্ষের


ভারতীয় পার্লামেণ্ট ভবন

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামোকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিল। নতুন যুগের বিজ্ঞান সাধনার সুফল ভারতবর্ষে আর্থিক উন্নতির কার্যে বিশেষ প্রয়োগ করা হয় নাই। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী দেশকে শোষণের কার্যে লিপ্ত ছিল। দেশবাসীর জীবনযাত্রার নিম্নমান উন্নত করিবার প্রচেষ্টা তাহাদের

মাঝে মোটেই ছিল না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই দেশ নেতাদের প্রধান চিন্তা হইল জাতির মান উন্নত করা। কিন্তু কাজ সহজ ছিল না। সামান্য একটি বাড়ী করিতে যদি নক্শার প্রয়োজন হয়, একটা বিরাট দেশকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে পরিকল্পনার ত' নিশ্চয়ই প্রয়োজন। এতবড় একটি দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে বহু অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। তাই সুবিধার জন্য সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ভাগ করিয়া পাঁচ বৎসর অন্তর এক একটি খণ্ড পরিকল্পনা রচনা করা ঠিক হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নাম দেওয়া হইল। এই ভাবে দেশ গড়ার নূতন কাজ ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হইল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয় ১৯৬১ সালের মার্চে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ;—খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা, জীবিকার সুযোগ পরিবর্ধন, ভারী ও মৌলিক শিল্প স্থাপন, সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি প্রধান। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের জন্য ১৭ শ' ১৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই মুদ্রা-স্ফীতি, দেশবিভাগ ও আরও নানা কারণে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই পরিকল্পনাগুলি ক্রমে ক্রমে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে প্রতিশ্রুত। কয়েক বছরেই দেশের জাতীয় আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১১০১০ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে একজনের ব্যক্তিগত গড় আয় ছিল বাৎসরিক ২৪৬ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৪ টাকা হইয়াছে।

পরিকল্পনাকালে সরকারী তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউর-কেল্লায় তিনটি বিশাল লৌহ প্রকল্প স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সিন্ধ্রী

ও নাঙ্গালে সারের কারখানা, ব্যাঙ্গালোরে বিমান নির্মাণের কারখানা, চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, আলোয়াতে ডি. ডি. টি. তৈয়ারীর কারখানা এবং আরও অনেক বড় বড় শিল্প সরকারী সহ-যোগিতায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। তাই পরিকল্পনা কালে কৃষির উন্নতি সাধনে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভূমি বিভাগ, প্রাচীন প্রথায় চাষ, সাধারণ বীজ প্রয়োগ এবং অনুন্নত সার প্রয়োগ বহুকাল ধরিয়া কৃষির উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই পল্লী অঞ্চলে উন্নয়ন ব্লক স্থাপন করিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত ধরনের বীজ, বৈজ্ঞানিক সার এবং জল সেচের মাধ্যমে কৃষির ফলন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইল। সর্বস্তরে শিক্ষা প্রাপ্ত কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ কৃষকদিগকে সহায়তা করিতে থাকিলেন। শিল্প ও কৃষি ছাড়াও পরিকল্পনায় শিক্ষা সংস্কৃতি ও আত্মোন্নয়নের ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, সমাজ শিক্ষা, কেন্দ্র, পাঠাগার ও পঞ্চায়েত স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের রাষ্ট্র উন্নয়নে যুক্ত করা হইল। চিকিৎসার সুবিধার জন্য দেশের বহু স্থানে নূতন নূতন হাসপাতাল স্থাপিত হইল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য নূতন নূতন সুবৃহৎ সড়ক নির্মাণ করিয়া গ্রামাঞ্চলকে শহরের সহিত যুক্ত করা হইল।

১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতে রাষ্ট্র পরি-চালনার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট এক দুই কক্ষ যুক্ত সংসদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার নিম্নকক্ষকে বলা হয় লোকসভা এবং উচ্চতর কক্ষকে বলা হয় রাজ্যসভা। লোকসভার সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন, রাজ্যসভার সদস্য পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রজাতান্ত্রিক ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫১-৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে এবং তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেসী দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ

করিয়া দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় নির্বাচনের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই বরাবর শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। আজ পর্যন্ত লোকসভায় কোন একটি বিরোধী দল গড়িয়া উঠে নাই। এই জন্য কোন বিরোধী দলের নেতার পদও সৃষ্টি হয় নাই।



জওহরলাল নেহরু

আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনের সাথে সাথে ভারত এক শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বিধা বিভক্ত বিশ্বে ভারত কোনো দলে যুক্ত না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্ব সমস্যার সমধানে ব্রতী রহিয়াছে। সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে ভারত বিশ্বাস করে। কয়েক বৎসর ধরিয়াই ভারত নিরস্ত্রীকরণে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রোএশিয়া মহাসম্মেলনে নেতৃত্ব করিয়া নিপীড়িত মানবতার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবিকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাই ভারত আজ সারা বিশ্বের বন্ধু। দুঃস্থ মানবতার পথপ্রদর্শক ও শান্তির অগ্রদূত।

পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ঃ ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছিল তখন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেও মুক্তির আন্দোলন ঘনাইয়া উঠিতেছিল। পশ্চিম এশিয়ার ও নিকটবর্তী আফ্রিকার দেশগুলিকে ইয়োরোপীয়রা বলে মধ্য প্রাচ্য। এ সমস্ত দেশে জাতীয় আন্দোলন অনেকটা সফলতা লাভ করিল। পারস্য ছিল নামে মাত্র স্বাধীন। ইহার প্রধান সম্পদ ছিল খনিজ তেল। দুর্বল শাহ্‌দের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ইংরেজ বণিকরা এই তেলের ব্যবসা হাত করিয়া লইয়াছিল। ১৯২৫ সালে রেজা খাঁ পহ্লবির নেতৃত্বে পারস্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল এবং বিদেশী শাসনের অবসান হইল। কিন্তু তৈলসম্পদ জাতির হাতে আসিল না। তুর্কীতে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কামাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয় জাগরণ দেখা দিল। কামাল জাতীয় বাহিনী গড়িয়া গ্রীকদের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন, দুর্বল সুলতানী উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তুর্কীকে এক আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন।

তুর্ক সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে তাহার অধীন আরব জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এবং সন্ধির পরে ইহাদের দেশ বিজয়ী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের আওতায় চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইরাক, সীরিয়া ও প্যালেস্টাইন স্বাধীনতা লাভ করিল। মিশরে জগলুল পাশার নেতৃত্বে প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯৩৬ সালে মিশর ইংরেজদের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু সুয়েজ খালের নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও সামরিক ঘাটি রহিয়া গেল। কিছুকাল আগে এক চুক্তির ফলে সুয়েজ অঞ্চলও মিশরের হাতে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পট-পরিবর্তন হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। জাপানীদের প্রবল আক্রমণে এই অঞ্চলে পাশ্চাত্ত্য ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙিয়া পড়িল। অবশেষে পরাস্ত হইয়া হটিয়া গেলেও জাপানী সেনা পরাধীন জাতিগুলির হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া গেল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে জাতীয়তাবাদীরা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং শেষে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ান যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিল। ব্রহ্মদেশে আউং সানের নেতৃত্বে জাপানী ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল। অবশেষে ইংলণ্ডের সরকার ভারত ও পাকিস্তানের মত ব্রহ্ম এবং সিংহলের স্বাধীনতাও স্বীকার করিলেন। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। ইন্দোচীনে ফরাসী প্রভুত্বের অবসান হইল। কিছুদিনের মধ্যে মালয়েও ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিল। বহু উত্থান পতনের পর মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক, উত্তর বোর্ণিও প্রভৃতির সমন্বয়ে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব মালয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রী টুংকু রহমান ও ব্রিটিশ সরকারের মাঝে গৃহীত হয়। ১৯৬২-এর ১লা আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের কমনওয়েলথ ও উপনিবেশ সচিব ডানকান সাণ্ডিজ কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে ১৯৬৩-এর ৩১শে আগস্টের মধ্যে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। যথাকালে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল।

চীন বিপ্লব ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চীন বিপ্লব। জাপানী আক্রমণ রুখিবার জন্য চীনের কম্যুনিস্ট ও কোমিণ্টাং দল হাত মিলাইয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভের পর এই ঐক্য আর টিকিল না।

তিন বছর ধরিয়া গৃহযুদ্ধ চলিল। কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে আরো কয়েকটি কোমিণ্টাং-বিরোধী দল মিলিত হইল। শেষে পরাজিত হইয়া

কোমিণ্টাং সরকার চীন পরিত্যাগ করিলেন এবং ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। ফরমোজায় চীনের কোমিণ্টাং সরকার এখনো টিকিয়া আছে।

১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর চীনে এক নূতন প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল। মাও সে-তুং রাষ্ট্রপতি হইলেন। সমস্ত জাতীয় দল লইয়া এক অস্থায়ী যুক্তসরকার স্থাপিত হইল। নূতন চীনের নামকরণ হইল "চীন জনতার প্রজাতন্ত্র"। এই সরকার নামে মাত্র সকল দলের সম্মিলিত সরকার, আসলে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট সরকার। যুক্তসরকার সমাজ ব্যবস্থার ও শাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিতে লাগিলেন।

১৯৪৯-এর ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার চীনের নূতন প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সরকারী ভাবে স্বীকার করিয়া লন। ইহার পর হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসরে ভারত ও চীনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় বন্ধুত্বভাব গড়িয়া উঠিল। এবং উভয় দেশ সম্মিলিত ভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি প্রবর্তন করিল। ভারতের শান্তিকামী সরকার এই দুই বিশাল দেশের মাঝে স্থায়ী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার এতদূর উদগ্রীব হইলেন যে তিব্বতের উপর বহিঃ সীমান্ত সম্পর্কীয় যত কিছু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভারতের এক্তিয়ারে ছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া তিব্বতকে চীনের একটি আভ্যন্তরীণ এলাকা বলিয়া মানিয়া লন এবং ১৯৫৪ সালে চীনের একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু চীনারা ভারতের সঙ্গে সহজ ও সরল সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক ছিল না। এখানেসেখানে দুই দেশের পারস্পরিক সীমানা চীনের মানচিত্রে ভুল ভাবে দেখান হইতে লাগিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই এর কাছে ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে সরাসরি বিষয়টি উত্থাপন করেন। যদিও মিঃ চৌ-এন-লাই জানান যে সীমানা-গুলি ভুলবশতঃ দেখান হইয়াছে, তবুও সেগুলি সংশোধন করিবার কোন প্রচেষ্টাই চীনা সরকার করিলেন না। ১৯৫৭ সালে উত্তর পশ্চিমের

লাডাক অঞ্চলে চীনা সৈন্যবাহিনী ভারত ভূমির উপর হামলা শুরু করিয়া অনেকটা জায়গা দখল করিয়া লইল এবং আকৃসাই চীন রাস্তা তৈয়ারী করিল। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে একটি ভারতীয় প্রহরারত সৈন্যবাহিনীকে চীনা সেনাবাহিনী হাজী লাঙ্গারের নিকট আটক করিয়া রাখে। ভারত সরকার চীনের এইসব কাজের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু চীনাদের মনে তখন সাম্রাজ্য লিপ্সা দেখা দিয়াছে। তাহারা লাডাকের আরও বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ফলে প্রহরারত ফৌজী বাহিনীর সঙ্গে তাহাদের এখানে ওখানে ছোট খাটো খণ্ডযুদ্ধ হইতে থাকে। ভারত সরকার ইহাকে সাময়িক সীমান্ত লড়াই মনে করিয়া ভাবিয়াছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ইহার একটি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

কিন্তু ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিল। চীনের ভূমিলিপ্সা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাইল। চীনা সরকার উত্তর পূর্ব সীমান্তে এবং লাডাক অঞ্চলের ৫০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত ভারতীয় জমির উপরে অধিকার দাবি করিয়া বসিলেন। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসিল। দুই প্রধান মন্ত্রী ১৯৬০ সালে দিল্লীতে মিলিত হইলেন; কিন্তু ক্ষমতাগর্বী চীনের ভূমিলিপ্সা কমিল না। ভারত ভূমিতে চীনা অনুপ্রবেশ অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। ১৯৬১ সাল হইতে ভারত সরকার প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন। লাডাক অঞ্চলে অগ্রসর হইতে ব্যর্থ হইয়া চীনা বাহিনী ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে—অতর্কিতে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা সার্থকতা লাভ করিবার পর চীনা বাহিনী ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর ভারত-চীন সীমান্তের পূর্ব ও পশ্চিম এলাকায় সুচিন্তিত

ভাবে এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাদ্বারা সাংঘাতিক রকমের আক্রমণ শুরু করে। তাহারা অনেকটা জমি দখল করিয়া লইয়া ভারত অন্তর্ভুক্ত আরও ২৫০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান দাবি করিয়া বসে। ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত চীনাদের সহিত সংঘর্ষ চলিল। ইতিমধ্যে ভারত নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে সমর্থ হইল। বিশ্বের শান্তিকামী জনমত চীনকে ধিক্কৃত করিল। চীন সারা বিশ্বে বন্ধুহীন হইয়া পড়িল। অবশেষে বাধ্য হইয়া ২১শে নভেম্বর ১৯৬২ তারিখে চীন সরকার এক ভাঁওতামূলক একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিল। কিন্তু ভূমিলিপ্সু চীনের যে ইহা একটি সাময়িক চাল মাত্র তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণ ভারতের অতীত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এবং আবহমান কাল ধরিয়া শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ। এদেশেরই মহাসন্তান বুদ্ধ, অশোক, চৈতন্য, কবীর, বিবেকানন্দ, গান্ধী প্রেম ও শান্তির বাণী বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন। তরবারির দ্বারা কাহাকেও জয় করা যায় না, এ উপলব্ধি ভারতবাসীর বহু শতাব্দীর। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির বৈষম্যের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ভারত বরাবরই শান্তির পথে আগ্রহশীল। সৌজন্য, মর্যাদা প্রীতি ও আত্মসম্মানের মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু পীত জাতি ভারতের বন্ধুত্ব, শান্তিকামনা ও উন্নতমনা আদর্শকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়া তরবারির সাহায্যে ভারতভূমিকে পদানত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে।

চৈনিক আক্রমণের তুইটি প্রত্যক্ষ ফল ফলিল। একটি, বর্ণ ধর্ম ভাষা প্রভৃতি নির্বিশেষে সমগ্র ভারত ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়টি, শান্তিপ্রিয় ও যুদ্ধবিরোধী ভারত সমরসজ্জার দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বোধ করিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগ্রহে ভারত স্বাধীনতার পরে প্রতিযোগিতামূলক

সমরোপকরণ প্রস্তুতির প্রয়োজন বোধ করে নাই। এবার চীনের বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রয়োজন দেখা দিল।

ইতোমধ্যে স্বাধীন ভারতের অন্যতম স্রষ্টা প্রধান মন্ত্রী জওহরলালের অমন অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘদিনের একটানা প্রাণক্ষয়ী পরিশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়া তিনি প্রথম অসুস্থ হইয়া পড়েন। তারপর ডাক্তারদের পরামর্শে বিশ্রাম গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু জওহরলাল নিজের দেহের অপটুতার জন্য নবীন ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা অন্যায় মনে করিয়াছেন। তাই কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করেন। কিন্তু তাহাও ঠিক সহ্য হইল না। বিপদ কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া জাতি যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই ১৯৬৪ সনের ২৭শে মে তারিখে ভারতের ইন্দ্রপতন ঘটিল। সমগ্র জাতি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সারা বিশ্বে সেই শোকের ছায়াপাত হইল। একালের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব-



লালবাহাদুর শাস্ত্রী

রূপে স্বীকৃত জওহরলালের মৃত্যু গণতন্ত্র ও শান্তিতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের ও জাতির ক্ষতিরূপে দেখা দিল।

জওহরলালের মৃত্যুর পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। জওহরলালের ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা লালবাহাদুরের নাই। কিন্তু বেঁটেখাটো নম্র মৃদুভাষী এই মানুষটির মধ্যে ইস্পাতের দৃঢ়তা লুক্কায়িত আছে। যাহারা মনে করিয়াছিল জওহরলালের মৃত্যুতে ভারত নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ভুল ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়াছে।

জন্মের পর হইতেই পাকিস্থান ভারতকে শত্রুরূপে গণ্য করিতেছে এবং নানা ব্যাপারে ভারতের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। একবার তাহারা কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হয়। চীন ভারত আক্রমণ করিবার পরে পাকিস্থান চীনের সঙ্গে মিতালি করে। ১৯৬৫ সনের ৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্থান পুনরায় কাশ্মীরে হানাদার পাঠায় এবং তৎপর বিমান বাহিনী ও সাঁজোয়া বাহিনীর দ্বারা জম্মুর ছাম্ব এলাকায় আক্রমণ চালায়। এরপরে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বাধ্য হইয়া ভারতকে পাকিস্থানের লাহোর এবং শিয়ালকোট প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে হয়। ফলে পাকিস্থানের ট্যাঙ্ক ও বিমান বহর অত্যন্ত মার খাইয়াছে। অতঃপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রস্তাবক্রমে যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু নির্লজ্জ পাকিস্থানের বেহায়াপনা তাহাতে কমে নাই।

এই ঘটনায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্ব ও দৃঢ়তার চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

কালক্রম

ইয়োরোপ		ভারত	অন্যান্য দেশ
প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়	১৮৭১		
জার্মানী ও অস্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর চুক্তি	৭৯		
কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম	৯০	৮৫ জাতীয় কংগ্রেস	
ফ্রান্স ও রুশের চুক্তি	৯১	১৯০৫ বঙ্গবিভাগ	
		০৯ শাসনসংস্কার	
		১১ বঙ্গবিভাগ রদ	
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	১৪		
ভার্সাই সন্ধি ও জাতিসঙ্ঘ	১৮		
ফাসিস্ত্ দলের জন্ম	১৯	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, শাসন-সংস্কার	তুর্ক বিপ্লব
		২০ মহাত্মাজীর প্রথম আন্দোলন	
		২৫	পারসীক বিপ্লব
জার্মানীতে নাৎসি একনায়কত্ব	৩৩	৩০ মহাত্মাজীর দ্বিতীয় আন্দোলন	
		৩৫ শাসন সংস্কার	
		৩৬	মিশরের আংশিক স্বাধীনতা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৩৯–৪৬	৪১ নেতাজীর ভারত ত্যাগ ৪২ গণবিদ্রোহ ৪৩ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত অভিযান	
রাষ্ট্রপুঞ্জ		৪৭ ভারত ও পাকিস্থানের স্বাধীনতা	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা (৪৬); সিংহল ও সীরিয়ার স্বাধীনতা (৪৭); ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা (৪৮); ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা.
		৪৮	
		৪৯	চীন বিপ্লব (৪৯)

পরিশিষ্ট

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। রিনাইসেন্স অর্থ কি? ইহা দ্বারা ইয়োরোপে কি কি পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল?

২। ছাপাখানা আবিষ্কার ও কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌-এর পতনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? এই দুই ঘটনা হইতে বর্তমান যুগের আরম্ভ ধরা হয় কেন?

৩। হিউম্যানিস্ট কাহাদিগকে বলে? একজন হিউম্যানিস্ট-এর কীর্তি বর্ণনা কর।

৪। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান?—(ক) লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (খ) শেক্‌স্‌পীয়ার (গ) গ্যালিলিও (ঘ) ম্যাকিয়াভেলি (ঙ) কেল্‌ভিন (চ) অষ্টম হেনরী।

৫। রিফর্মেশন আন্দোলনের পিছনে কি কি কারণ ছিল? ইহার নেতা কে ছিলেন? তাঁহার কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

৬। রিফর্মেশন আন্দোলন ইয়োরোপে কি কি পরিবর্তন আনিয়াছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ইয়োরোপে সমুদ্র-অভিযানের কারণ বিশ্লেষণ কর। কোন কোন দেশ ইহার উদ্যোক্তা ছিল?

২। নিম্নলিখিত নাবিকদের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ দাও:—(ক) কলম্বস (খ) ভাস্কো-ডা-গামা (গ) মাগেলান।

৩। সামুদ্রিক উদ্যোগের ফলাফল বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কি প্রকারে দিল্লীর সম্রাট হইলেন?

২। আকবর ও ঔরংজেবের চরিত্র তুলনা কর।

৩। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৪। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনবিধি কিরূপ ছিল? এখনকার শাসনবিধির সহিত ইহার মিল এবং তফাত কোথায়?

৫। মুঘল আমলের সংস্কৃতিতে কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

৬। মুঘল যুগে সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ উপাদান হইতে এ বিষয়ের তথ্য পাওয়া যায়?

চতুর্থ অধ্যায়

১। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের কি কাজ ছিল? ইহার সঙ্গে স্টুয়ার্ট রাজাদের বিবাদ বাধিল কেন?

২। পার্লামেণ্ট প্রথম চার্লসকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিল কেন? এ কাজের সমর্থন কর কি?

৩। ক্রমওয়েলের চরিত্র বর্ণনা কর।

৪। পার্লামেণ্ট রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিল কেন? ইহার পর হইতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রজীবনে কোন নূতনত্ব দেখা গেল কি?

পঞ্চম অধ্যায়

১। ইয়োরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারের সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? ইংরাজ ও ফরাসীরা কি প্রকারে ইহার সুযোগ লইয়াছিল?

২। ক্লাইভ কেমন করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন? তাঁহার নীতি ও চরিত্রের সমালোচনা কর।

৩। টিপু সুলতানের জীবনী ও চরিত্র বর্ণনা কর।

৪। করদ-মৈত্রী কাহাকে বলে? কে ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন? কোন্ কোন্ রাজ্য ইহা স্বীকার করিয়াছিল?

৫। শিখ জাতিকে কে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন? শিখদের পতন হইল কেন?

৬। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি? ইহা ব্যর্থ হইল কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডের উপর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল কেন? ব্রিটিশ সরকারের শুল্কনীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি ছিল?

২। এড্‌মণ্ড বার্ক ও জর্জ ওয়াশিংটনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

সপ্তম অধ্যায়

১। বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল? রাজা ষোড়শ লুই বিপ্লব দমন করিতে পারিলেন না কেন?

২। জাতীয় সভা ও জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন দেশ শাসনে কি কি পরিবর্তন আনিয়াছিল? উভয়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কোথায়?

৩। ভীতির রাজত্বের বিবরণ দাও। ইহার প্রবর্তন করিয়াছিল কাহারা? ইহার সমর্থন কর কি?

৪। নেপোলিয়ন কিসের জোরে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ভাঙিয়া দিয়া সম্রাট হইয়া বসিলেন? ইহার ফলে বিপ্লবের আদর্শ কতদূর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল?

৫। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের অবদান কি?

অষ্টম অধ্যায়

১ শিল্পবিপ্লব কাহাকে বলে? ইহা ইয়োরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন আনিয়াছিল?

২। বস্ত্রশিল্পে ও যানবাহনে যন্ত্রের দ্বারা কি কি উন্নতি সাধিত হইয়াছিল?

৩। শিল্পবিপ্লবের ফলাফল বিচার কর।

নবম অধ্যায়

১। ইতালীর ঐক্য সাধনে কোন্ কোন্ নায়কের অবদান ছিল? ইহাদের মধ্যে কাহার দান সবচেয়ে বেশী বলিয়া মনে হয়?

২। জার্মানীর ঐক্য কাহার নেতৃত্বে সাধিত হইয়াছিল? তাঁহার নীতির সঙ্গে ইতালীর রাষ্ট্রনেতাদের নীতির পার্থক্য কোথায়?

৩। ইতালী ও জার্মানীর ঐক্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল কোন কোন রাষ্ট্র? ঐক্যের ফলে এই দুই দেশে কি কি পরিবর্তন দেখা গেল?

দশম অধ্যায়

১। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে দাসপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল কি প্রকারে ?

২। উত্তর আমেরিকায় দাসপ্রথা অচল হইল এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বদ্ধমূল হইল, ইহার কারণ কি ?

৩। আমেরিকায় দাসপ্রথা রদ করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন কে ? তাঁহার কীর্তি বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়

১। এশিয়া ও আফ্রিকায় ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যবিস্তারের পিছনে কোন্ কোন্ প্রভাব কাজ করিয়াছিল ?

২। আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন কোন কোন্ ইয়োরোপীয় পর্যটক ? তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা কর।

৩। এশিয়ায় ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যবিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। ইয়োরোপীয় ও এশিয় জাতিগুলির উপর সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল ?

দ্বাদশ অধ্যায়

১। চীনের স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিয়াছিল কোন্ কোন্ বিদেশী জাতি ? কেমন করিয়া ইহারা চীনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল ?

২। চীনাদের উপর বিদেশী প্রভাব ও অত্যাচারের কি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ?

৩। চীনে দীর্ঘকাল ধরিয়া গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল কেন ? ইহার জন্য দায়ী কাহারা ?

৪। ইয়োরোপীয়দের আগমনের সময়ে জাপানীদের সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

৫। জাপানের আমূল সংস্কার সংঘটিত হইল কি কারণে ? এই সংস্কারের ফলে জাপানের রাষ্ট্রনীতিতে কোন্ পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। সমাজবাদ কাহাকে বলে ? ইহার গুরু কে ?

পর্ষদ কর্তৃক সংশোধিত মূল্য—২·২৭